বিশ্ব-পরিচয়

বিশ্ব-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
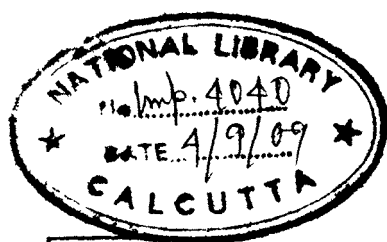
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু

প্রীতিভাজনেষু

এই বইখানি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। বলা বাহুল্য এর মধ্যে এমন বিজ্ঞানসম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য। জ্ঞানের রাজ্যে যেখানে তোমার স্থান সেখানে আমার এই অশিক্ষিত প্রয়াস পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু কালিদাস যাকে বলেন অশিক্ষিত পটুত্ব সেটা যে কেবল মেয়েদের বুদ্ধিতেই আছে তা নয় সাহিত্যিকের কলমেও তার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই রচনায় মাঝে মাঝে সাহিত্যচালনার সেই পটুত্ব যদি প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে হয়তো তোমার কৌতুক বোধ হবে। আমার এই নিজের অধিকারের মধ্যেই তোমার প্রশ্রয় পেতে পারব বলে আশা করি।

শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই, বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই। সেই দায়িত্ব নিয়েই আমি এ কাজ শুরু করেছি। কিন্তু এর জবাবদিহি একা কেবল সাহিত্যের কাছেই নয় বিজ্ঞানের কাছেও বটে। তথ্যের যাথার্থ্যে এবং

সেটাকে প্রকাশ করার যাথাযথ্যে বিজ্ঞান অল্পমাত্রও স্খলন ক্ষমা করে না। সেদিকেও আমি যথাসম্ভব সতর্ক হয়েছি। বস্তুত আমি কর্তব্য-বোধে লিখেছি কিন্তু কর্তব্য কেবল ছাত্রদের প্রতি নয় আমার নিজের প্রতিও। এই লেখার ভিতর দিয়ে আমার নিজেকেও শিক্ষা দিয়ে চলতে হয়েছে। এই ছাত্রমনোভাবের সাধনা হয়তো ছাত্রদের শিক্ষাসাধনার পক্ষে উপযোগী হোতেও পারে।

আমার কৈফিয়ৎটা তোমার কাছে একটু বড়ো করেই বলতে হচ্ছে, তাহোলেই এই লেখাটি সম্বন্ধে আমার মনস্তত্ত্ব তোমার কাছে স্পষ্ট হোতে পারবে।

বিশ্বজগৎ আপন অতি ছোটোকে ঢাকা দিয়ে রাখল, অতি বড়োকে ছোটো করে দিল, কিংবা নেপথ্যে সরিয়ে ফেলল। মানুষের সহজ শক্তির কাঠামোর মধ্যে ধরতে পারে নিজের চেহারাটাকে এমনি করে সাজিয়ে আমাদের কাছে ধরল। কিন্তু মানুষ আর যাই হোক সহজ মানুষ নয়। মানুষ একমাত্র জীব যে আপনার সহজ বোধকেই সন্দেহ করেছে, প্রতিবাদ করেছে, হার মানাতে পারলেই খুশি হয়েছে। মানুষ সহজ শক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দূরকে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ, দুর্বোধকে দিয়েছে ভাষা। প্রকাশলোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশ-লোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ ক'রে বিশ্বব্যাপারের মূল রহস্য কেবলি অবারিত করছে। যে সাধনায় এটা সম্ভব হয়েছে তার সুযোগ ও শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই

নেই। অথচ যারা এই সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হোলো তারা আধুনিক যুগের প্রত্যন্তদেশে একঘরে হয়ে রইল।

বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলি ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।

আমার মতো আনাড়ি এই অভাব অল্পমাত্র দূর করবার চেষ্টাতেও প্রবৃত্ত হোলে তারাই সব চেয়ে কৌতুক বোধ করবে যারা আমারি মতো আনাড়ির দলে। কিন্তু আমার তরফে সামান্য কিছু বলবার আছে। শিশুর প্রতি মায়ের ঔৎসুক্য আছে কিন্তু ডাক্তারের মতো তার বিদ্যা নেই। বিদ্যাটি সে ধার করে নিতে পারে কিন্তু ঔৎসুক্য ধার করা চলে না। এই ঔৎসুক্য শুশ্রূষায় যে রস জোগায় সেটা অবহেলা করবার জিনিস নয়।

আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না। আমার বয়স বোধ করি তখন নয় দশ বছর; মাঝে মাঝে রবিবারে হঠাৎ আসতেন সীতানাথ দত্ত মহাশয়। আজ জানি তাঁর পুঁজি বেশি ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের অতি

সাধারণ দুই একটি তত্ত্ব যখন দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতেন আমার মন বিস্ফারিত হয়ে যেত। মনে আছে আগুনে বসালে তলার জল গরমে হাল্‌কা হয়ে উপরে ওঠে আর উপরের ঠাণ্ডা ভারি জল নিচে নামতে থাকে, জল ফুটতে থাকার এই কারণটা যখন তিনি কাঠের গুঁড়োর যোগে স্পষ্ট করে দিলেন, তখন অনবচ্ছিন্ন জলে একই কালে যে উপরে নিচে এ রকম নিরন্তর ভেদ ঘটতে পারে তারি বিস্ময়ের স্মৃতি আজও মনে আছে। যে ঘটনাকে স্বতই সহজ ব'লে বিনা চিন্তায় ধরে নিয়েছিলুম সেটা সহজ নয় এই কথাটা সেই বোধ হয় প্রথম আমার মনকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তারপরে বয়স তখন হয়তো বারো হবে (কেউ কেউ যেমন রং-কানা থাকে আমি তেমনি তারিখ-কানা এই কথাটি বলে রাখা ভালো) পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ড্যালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে ক'রে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলায়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে, গিরিশৃঙ্গের বেড়া দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, জীবনে

এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।

তার পরে বয়স আরো বেড়ে উঠল। ইংরেজি ভাষা অনেকখানি আন্দাজে বোঝবার মতো বুদ্ধি তখন আমার খুলেছে। সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই যেখানে যত পেয়েছি পড়তে ছাড়িনি। মাঝে মাঝে গাণিতিক দুর্গমতায় পথ বন্ধুর হয়ে উঠেছে, তার কৃচ্ছ্রতার উপর দিয়েই মনটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছি। তার থেকে একটা এই শিক্ষা লাভ করেছি, যে জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতার পথে সবই যে আমরা বুঝি তাও নয় আর সবই সুস্পষ্ট না বুঝলে আমাদের পথ এগোয় না একথাও বলা চলে না। জলস্থল বিভাগের মতোই আমরা যা বুঝি তার চেয়ে না বুঝি অনেক বেশি, তবুও চলে যাচ্ছে এবং আনন্দ পাচ্ছি। কতক পরিমাণে না বোঝাটাও আমাদের এগোবার দিকে ঠেলে দেয়। যখন ক্লাসে পড়াতুম এই কথাটা আমার মনে ছিল। আমি অনেক সময়েই বড়ো-বয়সের পাঠ্য সাহিত্য ছেলেবয়সের ছাত্রদের কাছে ধরেছি। কতটা বুঝেছে তার সম্পূর্ণ হিসাব নিইনি, হিসাবের বাইরেও তারা একরকম ক'রে অনেকখানি বোঝে যা মোটে অপথ্য নয়। এই বোধটা পরীক্ষকের পেনসিল মার্কার অধিকারগম্য নয় কিন্তু এর যথেষ্ট মূল্য আছে। অন্তত আমার জীবনে এই রকম পড়ে-পাওয়া জিনিস বাদ দিলে অনেকখানিই বাদ পড়বে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম। এই

বিষয়ের বই তখন কম বের হয় নি। স্যর রবর্ট বল্-এর বড়ো বইটা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাঙ্ক্ষায় নিউকোম্ব্‌স্, ফ্লামরিয়ঁ প্রভৃতি অনেক লেখকের অনেক বই পড়ে গেছি—গলাধঃকরণ করেছি শাঁস সুদ্ধ বীজ সুদ্ধ। তারপরে এক সময়ে সাহস ক'রে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্স্‌লির এক সেট প্রবন্ধমালা। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলি এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না, অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধ বিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলেকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করিনে।

আজ বয়সের শেষ পর্বে মন অভিভূত নব্য প্রাকৃততত্ত্বে— বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে। তখন যা পড়েছিলুম, তার সব বুঝিনি। কিন্তু পড়ে চলেছিলুম। আজও যা পড়ি তার সবটা বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব, অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষেও তাই।

বিজ্ঞান থেকে যাঁরা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী।—মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, আমি রস পাই মাত্র। সেটা গর্ব করবার মতো কিছু নয়, কিন্তু মন খুশি হয়ে বলে যথা লাভ। এই বইখানা সেই যথালাভের ঝুলি, মাধুকরী বৃত্তি থেকে এর সংগ্রহ।

পাণ্ডিত্য বেশি নেই সুতরাং সেটাকে বেমালুম করে রাখতে বেশি চেষ্টা পেতে হয়নি। চেষ্টা করেছি ভাষার দিকে। বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্যে পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্ব্যজাতের জিনিস। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে করেই যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।

এই বইখানিতে একটি কথা লক্ষ্য করবে—এর নৌকোটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে কিন্তু মাল খুব বেশি কমিয়ে দিয়ে একে হাল্‌কা করা কর্তব্য-বোধ করিনি। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না। আমার মত এই যে যাদের মন কাঁচা তারা যতটা. স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনিই ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই ব'লে তাদেব পাতটাকে প্রায় ভোজ্যশূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়। যে বিষয়টা শেখবার সামগ্রী, নিছক ভোগ করবার নয়, তার উপর দিয়ে অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বলা যায় না। মন দেওয়া এবং চেষ্টা করে বোঝাটাও শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর। নিজের যে শিক্ষার চেষ্টা বাল্যকালে গ্রহণ করেছিলুম তার থেকে আমার এই অভিজ্ঞতা। এক বয়সে দুধ যখন ভালবাসতুম না, তখন গুরুজনদের ফাঁকি দেবার জন্যে দুধটাকে প্রায় আগাগোড়া ফেনিয়ে বাটি ভরতি করার চক্রান্ত করেছি। ছেলেদের পড়বার বই যাঁরা লেখেন দেখি তাঁরা প্রচুর পরিমাণে ফেনার জোগান দিয়ে থাকেন। এইটে ভুলে যান জ্ঞানের যেমন আনন্দ আছে তেমনি তার

মূল্যও আছে, ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস হোতে থাকলে যথার্থ আনন্দের অধিকারকে ফাঁকি দেওয়া হয়। চিবিয়ে খাওয়াতেই একদিকে দাঁত শক্ত হয় আর একদিকে খাওয়ার পুরো স্বাদ পাওয়া যায়, এ বই লেখবার সময়ে সে কথাটা সাধ্যমতো ভুলিনি।

(শ্রীমান প্রমথনাথ সেনগুপ্ত এম্. এস্-সি তোমারি ভূতপূর্ব ছাত্র। তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অধ্যাপক। বইখানি লেখবার ভার প্রথমে তাঁর উপরেই দিয়েছিলেম। ক্রমশ সরে সরে ভারটা অনেকটা আমার উপরেই এসে পড়ল। তিনি না শুরু করলে আমি সমাধা করতে পারতুম না, তাছাড়া অনভ্যস্ত পথে শেষ পর্যন্ত অব্যবসায়ীর সাহসে কুলোত না।

আলমোড়ায় নিভৃতে এসে লেখাটাকে সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। মস্ত সুযোগ হোলো আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু রশী সেনকে পেয়ে। তিনি যত্ন করে এই রচনার সমস্তটা পড়েছেন। পড়ে খুশি হয়েছেন এইটেতেই আমার সব চেয়ে লাভ)

আমার অসুখ অবস্থায় স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় যত্ন ক'রে প্রুফ সংশোধন করে দিয়ে বইখানি প্রকাশের কাজে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন; এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

শান্তিনিকেতন
২ আশ্বিন, ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচী
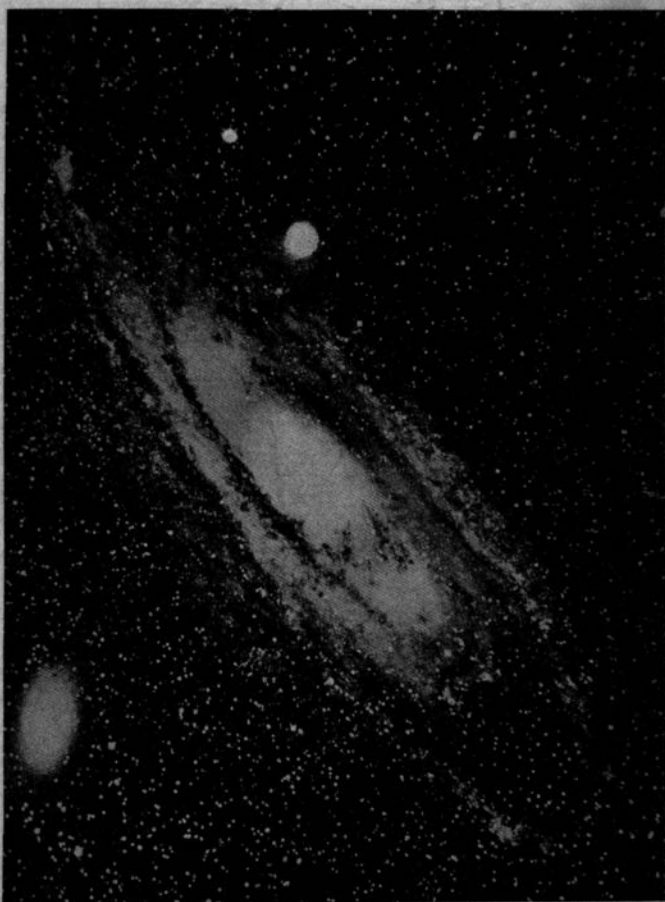
বিশ্ব-পরিচয়

অ্যাণ্ড্রোমীডার নীহারিকা

বিশ্ব-পরিচয়

পরমাণুলোক

আমাদের সজীব দেহ কতকগুলি বোধের শক্তি নিয়ে জন্মেছে, যেমন দেখার বোধ, শোনার বোধ, ঘ্রাণের বোধ, স্বাদের বোধ, স্পর্শের বোধ। এইগুলিকে বলি অনুভূতি। এদেরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ভালোমন্দ লাগা, আমাদের সুখদুঃখ।

আমাদের এই সব অনুভূতির সীমানা বেশি বড়ো নয়। আমরা কতদূরই বা দেখতে পাই, কতটুকু শব্দই বা শুনি। অন্যান্য বোধগুলিরও দৌড় বেশি নয়। তার মানে, আমরা যেটুকু শক্তির সম্বল নিয়ে এসেছি সে কেবল এই পৃথিবীতেই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়ে চলবার উপযুক্ত।

যে নক্ষত্র থেকে এই পৃথিবীর জন্ম, যার জ্যোতি এর প্রাণকে পালন করছে সে হচ্ছে সূর্য। এই সূর্য আমাদের চারদিকে আলোর পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীকে ছাড়িয়ে জগতে আর যে কিছু আছে তা দেখতে দিচ্ছে না।

কিন্তু দিন শেষ হয়, সূর্য অস্ত যায়, আলোর ঢাকা যায় সরে, তখন অন্ধকার ছেয়ে বেরিয়ে পড়ে অসংখ্য নক্ষত্র। বুঝতে পারি জগৎটার সীমানা পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। কিন্তু কতটা যে দূরে তা কেবল অনুভূতিতে ধরতে পারিনে।

সেই দূরত্বের সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগ চোখের দেখা দিয়ে। সেখান থেকে শব্দ আসে না, কেননা শব্দের বোধ হাওয়ার থেকে। এই হাওয়া চাদরের মতো পৃথিবীকেই জড়িয়ে আছে। এই হাওয়া পৃথিবীর মধ্যেই শব্দ জাগায়, এবং শব্দের ঢেউ চালাচালি করে। পৃথিবীর বাইরে ঘ্রাণ আর স্বাদের কোনো অর্থই নেই। আমাদের স্পর্শ-বোধের মধ্যে একটা বোধ হচ্ছে ঠাণ্ডা গরমের বোধ। পৃথিবীর বাইরের সঙ্গে আমাদের এই বোধটার অন্তত এক জায়গায় খুবই যোগ আছে। সূর্যের থেকে রোদ্দুর আসে, রোদ্দুর থেকে পাই গরম। সেই গরমে আমাদের প্রাণ। সূর্যের চেয়ে লক্ষগুণ গরম নক্ষত্র আছে তার তাপ আমাদের বোধে পৌঁছয় না। কিন্তু সূর্যকে তো আমাদের পর বলা যায় না। অন্য যে সব অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সূর্য তাদের মধ্যে সকলের চেয়ে আমাদের আত্মীয়। মানতে হবে, সূর্য পৃথিবী থেকে আছে দূরে। কম দূরে নয়, ন কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল তার দূরত্ব। শুনে চমকে উঠলে চলবে না। যে ব্রহ্মাণ্ডে আমরা আছি এখানে ঐ দূরত্বটা নক্ষত্রলোকের সকলের চেয়ে নিচের

ক্লাসের। কোনো নক্ষত্রই ওর চেয়ে পৃথিবীর কাছে নেই।

এই সব দূরের কথা শুনে আমাদের মনে চমক লাগে তার কারণ জলে মাটিতে তৈরি এই পিণ্ডটি, এই পৃথিবী অতি ছোটো। পৃথিবীর দীর্ঘতম লাইনটি অর্থাৎ তার বিষুব রেখার কটিবেষ্টন, ঘুরে আসার পথ প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল মাত্র। বিশ্বের পরিচয় যতই এগোবে ততই দেখতে পাবে জগতের দূরত্বের ফর্দে এই পঁচিশ হাজার সংখ্যাটা অত্যন্ত নগণ্য। পূর্বেই বলেছি আমাদের বোধশক্তির সীমা অতি ছোটো। সর্বদা যেটুকু দূরত্ব নিয়ে আমাদের কারবার করতে হয় তা কতটুকুই বা। কিন্তু সেইটুকুতেই আমাদের প্রাণধারণের প্রয়োজন পেরিয়েও অনেকখানি বাড়তি থাকে। ঐ সামান্য দূরত্বটুকুর মধ্যেই আমাদের দেখার আমাদের চলাফেরার বরাদ্দ নির্দিষ্ট।

কিন্তু পর্দা যখন উঠে গেল, তখন আমাদের অনুভূতির সামান্য সীমানার মধ্যেই বৃহৎ বিশ্ব নিজেকে নিতান্ত ছোটো করে একটুখানি আভাসে জানান দিলে, তা না হোলে জানা হোতই না, কেননা বড়ো দেখার চোখ আমাদের নয়। অন্য জীবজন্তুরা এইটুকু দেখাই মেনে নিলে। যতটুকু তাদের অনুভূতিতে ধরা দিল ততটুকুতেই তারা সন্তুষ্ট হোলো। মানুষ হোলো না। ইন্দ্রিয়বোধে জিনিসটার ঈষৎ ইশারা মাত্র জানালে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির দৌড় তার বোধের চেয়ে আরো অনেক বেশি, জগতের সকল

দৌড়ের সঙ্গেই সে পাল্লা দেবার স্পর্ধা রাখে। সে এই প্রকাণ্ড জগতের প্রকাণ্ড মাপের খবর জানতে বেরল, অনুভূতির ছেলে-ভুলোনো গুজব দিলে বাতিল করে। ন কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইলকে আমরা কোনো মতেই অনুভব করতে পারিনে, কিন্তু বুদ্ধি হার মানলে না, হিসেব কষতে বসল।

বাইরের বিশ্বলোকটার কথা থাক্, আমরা যে পৃথিবীতে আছি, তার চেয়ে কাছে তো আর কিছু নেই, তবু এর সমস্তটাকে এক করে দেখা আমাদের বোধের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু একটি ছোট গ্লোবে যদি তার ম্যাপ আঁকা দেখি, তাহোলে পৃথিবীর সমগ্রটাকে জানার একটুখানি গোড়া পত্তন হয়। আয়তন হিসাবে গ্লোবটি পৃথিবীর অনেক হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। আমাদের অন্য সব বোধ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র দৃষ্টিবোধের আঁচড়-কাটা পরিচয় এতে আছে। বিস্তারিত বিবরণ হিসাবে এ একেবারে ফাঁকা। বেশি দেখবার শক্তি আমাদের নেই বলেই ছোটো করেই দেখাতে হোলো।

প্রতিরাত্রে বিশ্বকে এই যে ছোটো করেই দেখানো হয়েছে সেও আমাদের মাথার উপরকার আকাশের গ্লোবে। দৃষ্টিবোধ ছাড়া অন্য কোনো বোধ এর মধ্যে জায়গা পায় না। যা চিন্তা করতে মন অভিভূত হয়ে যায় এত বড়ো জিনিসকে দিকসীমানায় বদ্ধ এই আকাশটুকুর মধ্যে আমাদের কাছে ধরা হোলো।

কতই ছোটো করে ধরা হয়েছে তার একটুখানি আন্দাজ পেতে হোলে সূর্যের দৃষ্টান্ত মনে আনতে হবে। স্বভাবতই

আমরা যত কিছু বড়ো জিনিসকে জানি বা মনে আনতে পারি তার মধ্যে সব চেয়ে বড়ো এই পৃথিবী। একে আমরা অংশ অংশ করেই দেখতে পারি। একসঙ্গে সবটার প্রকৃত ধারণা আমাদের বোধের পক্ষে অসম্ভব। অথচ সূর্য এই পৃথিবীর চেয়ে চোদ্দ লক্ষ গুণে বড়। এত বড় সূর্য আকাশের একটা ধারে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছে একটি সোনার থালার মতো। সূর্যের ভিতরকার সমস্ত তুমুল তোলপাড়ের যখন খবর পাই আর তার পরে যখন দেখি ভোরবেলায় আমাদের আমবাগানের পিছন থেকে সোনার চাকাটি ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসছে, জীবজন্তু গাছপালা আনন্দিত হয়ে উঠছে, তখন মনে ভাবি আমাদের কী রকম ভুলিয়ে রাখা হয়েছে; আমাদের বলে দিয়েছে তোমাদের জীবনের কাজে এর বেশি জানবার কোনো দরকার নেই। না ভোলালেই বা বাঁচতুম কী করে। ঐ সূর্য আপন বিরাট স্বরূপে যা, সে যদি আমাদের অনুভূতির অল্পমাত্রও কাছে আসত তাহোলে তো আমরা মুহূর্তেই লোপ পেয়ে যেতুম। এই তো গেল সূর্য। এই সূর্যের চেয়ে আরো অনেক গুণ বড়ো আছে আরো অনেক অনেক নক্ষত্র। তাদের দেখছি কতকগুলি আলোর ফুট্‌কির মতো। যে দূরত্বের মধ্যে এই সব নক্ষত্র ছড়ানো ভেবে তার কিনারা পাওয়া যায় না। বিশ্বজগতের বাসা যে আকাশটাতে সেটা যে কত বড়ো সে কথা আর একদিক থেকে ভেবে দেখা যেতে পারে। আমাদের তাপবোধে পৃথিবীর বাইরে থেকে একটা খুব বড় খবর খুব জোরের

সঙ্গেই এসে পৌঁছচ্ছে, সে হচ্ছে রৌদ্রের উত্তাপ। এ খবরটা ন কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরের। কিন্তু ঐ তো আকাশে আকাশে আছে বহুকোটি নক্ষত্র, তাদের মধ্যে কোনো কোনোটি সূর্যের চেয়ে বহুলক্ষগুণ বেশি উত্তপ্ত। কিন্তু আমাদের ভাগ্যগুণে তাদের সম্মিলিত গরম পথেই এতটা মারা গেল যে বিশ্বজোড়া অগ্নিকাণ্ডে আমাদের আকাশটা দুঃসহ হোলো না। কত দূরের এই পথ, কত প্রকাণ্ড এই আকাশ। (বড়ো যজ্ঞের রান্নার যে চুলি জ্বলছে তার কাছে বসা আরামের নয় কিন্তু বেলা দশটার কাছাকাছি শহরের সমস্ত রান্না ঘরে যে আগুন জ্বলে বড়ো আকাশে তা ছড়িয়ে যায় বলেই সহরে বাস করতে পারি। নক্ষত্রলোকের ব্যাপারটাও সেই রকম। সেখানকার আগুনের ঘটা যতই প্রচণ্ড হোক, তার চারদিকের আকাশটা আরো অনেক প্রকাণ্ড)

এই বিরাট দূরত্ব থেকেও নক্ষত্রদের অস্তিত্বের খবর এনে দিচ্ছে কিসে? সহজ উত্তর হচ্ছে আলো। কিন্তু আলো যে চুপচাপ বসে খবর আউড়িয়ে যায় না, আলো যে ডাকের পেয়াদার মতো খবর পিঠে করে নিয়ে দৌড়ে চলে, বিজ্ঞানের এই একটা মস্ত আবিষ্কার। চলা বলতে সামান্য চলা নয়, এমন চলা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোনো দূতেরই নেই। আমরা ছোট পৃথিবীর মানুষ, তাই এতকাল জগতের সব চেয়ে বড়ো চলার কথাটা জানবার সুযোগ পাইনি। একদিন বিজ্ঞানীদের অত্যাশ্চর্য হিসাবের কলে ধরা পড়ে গেল, আলো

চলে সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে। এমন একটা বেগ যা অঙ্কে লেখা যায়, মনে আনা যায় না। বুদ্ধিতে যার পরীক্ষা হয়, অনুভবে হয় না। আলোর এই চলনের দৌড় অনুভবে বুঝব এই পৃথিবীটুকুতে এত বড় জায়গা পাব কোথায়। এইটুকুর মধ্যে ওর চলাকে আমরা না-চলার মতোই দেখে আসছি। পরখ করবার মতো স্থান পাওয়া যায় মহাশূন্যে। সূর্য আছে সেই মহাশূন্যের যে দূরত্ব মাত্রা নিয়ে, সে যত কোটি মাইলই হোক, জ্যোতিষ্কলোকের দূরত্বের মাপকাঠিতে খুব বেশি নয়।

সুতরাং এইটুকু দূরত্বের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট মাপে মানুষ আলোর দৌড় দেখতে পেল। খবর মিলল যে, এই শূন্য পেরিয়ে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসে সাড়ে আট মিনিটে। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টির পাল্লায় সূর্য যখন উপস্থিত, আসলে তার আগেই সে এসেছে। এই আগমনের খবরটি জানাতে আলো-নকিবের মিনিট আষ্টেক দেরি হোলো। এইটুকু দেরিতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। প্রায় তাজা খবরই পাওয়া গেছে। কিন্তু সৌরজগতের সব চেয়ে কাছে আছে যে নক্ষত্র, অর্থাৎ নক্ষত্রমহলে যাকে আমাদের পাড়া-পড়শি বললে চলে, যখন সে জানান দিল “এই যে আমি” তখন তার সেই বার্তা বয়ে আনতে আলোর সময় লাগছে প্রায় চার বছরের উপর। অর্থাৎ এইমাত্র যে খবর পাওয়া গেল সেটা চার বছরের বাসি। এইখানে দাঁড়ি টানলেই যথেষ্ট হোত, কিন্তু আরো দূরের নক্ষত্র আছে যেখান থেকে

আলো আসতে বহু লক্ষ বছর লাগে। আকাশে আলোর এই চলাচলের খবর বেয়ে বিজ্ঞানে একটা প্রশ্ন উঠল, তার চলার ভঙ্গীটা কী রকম। সেও এক আশ্চর্য কথা। উত্তর পাওয়া গেছে তার চলা অতি সূক্ষ্ম ঢেউয়ের মতো। কিসের ঢেউ সে কথা ভেবে পাওয়া যায় না; কেবল আলোর ব্যবহার থেকে এটা একেবারে নিশ্চিত জানা গেছে ওটা ঢেউ বটে। কিন্তু মানুষের মনকে হয়রান করবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গেই একটা জুড়ি খবর তার সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে হাজির হোলো, জানিয়ে দিলে, আলো অসংখ্য জ্যোতিষ্কণা নিয়ে, অতি খুদে ছিটেগুলির মতো ক্রমাগত তার বর্ষণ। এই দুটো উল্‌টো খবরের মিলন হোলো কোন্‌খানে তা ভেবে পাওয়া যায় না। এর চেয়েও আশ্চর্য একটা পরস্পর উল্‌টো কথা আছে, সে হচ্ছে এই যে, বাইরে যেটা ঘটছে সেটা একটা কিছু ঢেউ আর বর্ষণ, আর ভিতরে আমরা যা পাচ্ছি তা, না এটা, না ওটা, তাকে আমরা বলি আলো ;—এর মানে কী, কোনো পণ্ডিত তা বলতে পারলেন না।

যা ভেবে ওঠা যায় না, যা দেখা শোনার বাইরে, তার এত সূক্ষ্ম খবর পাওয়া গেল কী করে, এ প্রশ্ন মনে আসতে পারে। নিশ্চিত প্রমাণ আছে, আপাতত একথা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যাঁরা প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন অসাধারণ তাঁদের জ্ঞানের তপস্যা, অত্যন্ত দুর্গম তাঁদের সন্ধানের পথ। তাঁদের কথা যাচাই ক'রে নিতে যে বিদ্যা বুদ্ধির দরকার, তাও আমাদের অনেকের নেই। অল্প বিদ্যা নিয়ে অবিশ্বাস করতে

গেলে ঠকতে হবে। প্রমাণের রাস্তা খোলাই আছে। সেই রাস্তায় চলবার সাধনা যদি করো, শক্তি যদি হয় তবে একদিন এ সব বিষয় নিয়ে সওয়াল জবাব সহজেই হোতে পারবে।

আপাতত আলোর ঢেউয়ের কথাটাই বুঝে নেওয়া যাক। এই ঢেউ একটিমাত্র ঢেউয়ের ধারা নয়। এর সঙ্গে অনেক ঢেউ দল বেঁধেছে। কতকগুলি চোখে পড়ে, অনেকগুলি পড়ে না। এইখানে বলে রাখা ভালো, যে আলো চোখে পড়ে না, চলতি ভাষায় তাকে আলো বলে না। কিন্তু দৃশ্যই হোক, অদৃশ্যই হোক, একটা কোনো শক্তির এই ধরণের ঢেউ-খেলিয়ে চলাই যখন উভয়েরই স্বভাব, তখন বিশ্বতত্ত্বের বইয়ে ওদের পৃথক নাম অসংগত। বড় ভাই নামজাদা, ছোট ভাইকে কেউ জানে না, তবু বংশগত ঐক্য ধরে উভয়েরই থাকে একই উপাধি, এও তেমনি।

আলোর ঢেউয়ের আপন দলের আরো একটি ঢেউ আছে, সেটা চোখে দেখিনে, স্পর্শে বুঝি। সেটা তাপের ঢেউ। সৃষ্টির কাজে তার খুবই প্রতাপ। এমনিতরো আলোর ঢেউ জাতীয় নানা পদার্থের কোনোটা দেখা যায়, কোনোটা স্পর্শে বোঝা যায়, কোনোটাকে স্পষ্ট আলো-রূপে জানি আবার সেই সঙ্গেই তাপরূপেও বুঝি, কোনোটাকে দেখাও যায় না, স্পর্শেও পাওয়া যায় না। আমাদের কাছে প্রকাশিত অপ্রকাশিত আলো তরঙ্গের ভিড়কে যদি এক নাম দিতে হয়, তবে তাকে তেজ বলা যেতে পারে। বিশ্বসৃষ্টির আদি অন্তে মধ্যে প্রকাশ্য আছে বা লুকিয়ে আছে বিভিন্ন অবস্থায়

এই তেজের কাঁপন। পাথর হোক লোহা হোক বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় তাদের মধ্যে কোনো নড়াচড়া নেই। তারা যেন স্থিরত্বের আদর্শস্থল। কিন্তু একথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, তাদের অণু পরমাণু, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, যাদের দেখতে পাইনে, অথচ যাদের মিলিয়ে নিয়ে এরা আগাগোড়া তৈরি, তারা সকল সময়েই ভিতরে ভিতরে কাঁপছে। ঠাণ্ডা যখন থাকে তখনো কাঁপছে, আর কাঁপুনি যখন আরো চড়ে ওঠে তখন গরম হয়ে বাইরে থেকেই ধরা পড়ে আমাদের বোধ-শক্তিতে। আগুনে পোড়ালে লোহার পরমাণু কাঁপতে কাঁপতে এত বেশি অস্থির হয়ে ওঠে যে তার উত্তেজনা আর লুকানো থাকে না। তখন কাঁপনের ঢেউ আমাদের শরীরের স্পর্শ-নাড়ীকে ঘা মেরে তার মধ্য দিয়ে যে খবরটা চালিয়ে দেয় তাকে বলি গরম। বস্তুত গরমটা আমাদের মারে। আলো মারে চোখে, গরম মারে গায়ে।

ছেলেবেলায় যখন একদিন মাষ্টার মশায় দেখিয়ে দিলেন লোহার টুক্‌রো আগুনে তাতিয়ে প্রথমে হয় গরম, তার পরে হয় লাল দগদগে, তার পরে হয় সাদা জ্বলজ্বলে, বেশ মনে আছে তখন আমাকে এই কথা নিয়ে ভাবিয়েছিল যে, আগুন তো কোন একটা দ্রব্য নয় যেটা লোহার সঙ্গে বাইরে থেকে মিশিয়ে লোহাকে দিয়ে এমনতরো নানা রকম ভাও বাৎলিয়ে দিতে পারে। তার পরে আজ শুনছি আরো তাপ দিলে এই লোহাটা গ্যাস হয়ে যাবে। এ সমস্তই জাদুকর তাপের কাণ্ড, সৃষ্টির আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত চলেছে।

সূর্যের আলো সাদা। এই সাদা রঙে মিলিয়ে আছে সাতটা বিভিন্ন রঙের আলো। যেন সাত রঙের রশ্মির পেখম, গুটিয়ে ফেললে দেখায় সাদা, ছড়িয়ে ফেললে দেখায় সাতরঙা। সেকালে ছিল ঝাড় লণ্ঠন, বিজলি বাতির তাড়ায় তারা হয়েছে দেশছাড়া। এই ঝাড়ের গায়ে ঝুলত তিনপিঠওয়ালা কাঁচের পরকলা। এই রকম তিনপিঠওয়ালা কাঁচের গুণ এই যে, ওর ভিতর দিয়ে রোদ্দুর এলে তার থেকে সাত রঙের আলো ছড়িয়ে পড়ে। পরে পরে রং বিছানো হয়; বেগ্‌নি (Violet) অতিনীল (Indigo) নীল (Blue) সবুজ (Green) হল্‌দে (Yellow) নারাঙী (Orange) আর লাল (Red)। এই সাতটা রঙ চোখে দেখা যায় কিন্তু এদের দুই প্রান্তের বাইরে আরো ভিন্ন তেজের ঢেউ আছে, তারা আমাদের সহজ চেতনায় ধরা দেয় না। সেই জাতের যে তেজ বেগনি রঙের পরের পারে তাকে বলে ultra-violet light, সহজ ভাষায় বলা যাক বেগনি-পারের আলো। আর যে আলো লালের এলাকায় এসে পৌঁছয়নি, রয়েছে তার আগের পারে তাকে বলে infra-red light, আমরা বলতে পারি লাল-উজানি আলো। স্যর উইলিয়ম হর্শেল ছিলেন এক মস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনপিঠওয়ালা কাঁচের মধ্য দিয়ে তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন আলোর সাতরঙা ছটা। তাপ পরখের কাঁচের নল নিয়ে এক একটা রঙের কাছে ধরে দেখলেন। বেগনির থেকে যতই লালের দিকে নিয়ে গেলেন ততই তাপমাত্রার লক্ষণ বাড়তে লাগল। তার

পরে লাল পেরিয়ে নলটিকে নিয়ে গেলেন বেরঙা অন্ধকারে, গরম আরো চড়ে উঠল। বোঝা গেল আরো আলো আছে ঐ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। তারপর এলেন এক জর্মন রসায়নী। একটা ফোটোগ্রাফির প্লেট নিয়ে পরীক্ষায় লাগলেন। এই প্লেটে লাল থেকে বেগনি পর্যন্ত সাতটা রঙের সাড়া পাওয়া গেল। শেষে বেগনি পেরিয়ে চললেন অন্ধকারে, সেখানে চোখে যা ধরা দেয় না, প্লেটে তা দিল ধরা। এককালে মনে হয়েছিল অ-দেখারা রঙিন দলেরই পার্শ্বচর, অন্ধকারে পড়ে গেছে। যত এগোতে লাগল গুপ্ত আলোর সন্ধান, ততই সাতরঙা দলেরই আসন হোলো খাটো। বিজ্ঞানের জরিপে আজ সাতরং-রাজার দেশ ছাড়িয়ে গেছে আলোর সীমানা শতগুণ। লাল-উজানি আলোর দিকে ক্রমে আজ দেখা দিল যে ঢেউ সেই ঢেউ বেয়ে চলে আকাশ-বাণী, যাকে বলে রেডিয়ো বার্তা, বেগনি পারের দিকে প্রকাশ পেল বিখ্যাত র‍্যণ্টগেন আলো, যে আলোর সাহায্যে দেহের চামড়ার ঢাকা পেরিয়ে ভিতরকার হাড় দেখতে পাওয়া যায়।

সব রং মিলে সূর্যের আলো সাদা তবে কেন নানা জিনিসে নানা রং দেখি। তার কারণ সব জিনিস সব রং নিজের মধ্যে নেয় না, কোনো কোনোটাকে বিনা ওজরে বাইরে বিদায় করে দেয়। সেই ফেরৎ দেওয়া রংটাই আমাদের চোখের লাভ। মোটা ব্লটিং যে রসটা শুষে ফেলে সে কারো ভোগে লাগে না, যে রসটা সে নেয় না সেই উদ্বৃত্ত

রসটাই আমাদের পাওনা। এও তেমনি। চুনি পাথর সূর্যকিরণের আর সব রকম ঢেউকেই মেনে নেয়, ফিরিয়ে দেয় লাল রংকে। তার এই ত্যাগের দানেই চুনির খ্যাতি। যা নিজে আত্মসাৎ করেছে তার কোনো খ্যাতি নেই। লাল রংটাই কেন যে ও নেয় না, আর নীল রঙের পরেই নীলা পাথরের কেন সম্পূর্ণ বৈরাগ্য এ প্রশ্নের জবাব ওদের পরমাণু মহলে লুকানো রইল। আকাশের রং দেখতে পাই নীল তার কারণ দূর আকাশে যে সব সূক্ষ্ম বস্তুকণা ভাসে কেবল ছোট নীল রঙের ঢেউকেই তারা ছড়িয়ে দিতে পারে। বৃষ্টির পর তার থেকে যখন স্থূলতর কণা ধুয়ে যায় তখন আকাশ আরো নীল দেখতে হয়। পাকা-চুল সূর্যের সব ঢেউকেই ফিরে পাঠায় তাই সে সাদা, কাঁচা চুল কোনো ঢেউই ফিরে দেয় না তাই সে কালো। জগতে সব জিনিসই যদি সূর্যের সব রংই করত আত্মসাৎ তাহোলে সেই কৃপণের জগৎটা দেখা দিত কালো হয়ে, অর্থাৎ দেখাই দিত না। যেন খবর বিলোবার সাতটা পেয়াদাকেই পোস্টমাস্টার বন্ধ করে রাখত। অথচ কোনো আলোই যদি না নিত সবই হোত সাদা, তবে সেই একাকারে সব জিনিসেরই প্রভেদ যেত ঘুচে। যেন সাতটা পেয়াদার সব চিঠিই তাল পাকিয়ে একখানা করা হোত, কোনো স্বতন্ত্র খবরই পাওয়া যেত না। একই চেহারায় সবাইকে দেখাকে দেখা বলে না। না-আলো আর পূর্ণ আলো কোনটাতেই আমাদের দেখা চলে না, আমরা দেখি ভাঙা আলোর মেলামেশায়।

পাকা চুলকে সাদা দেখায় কেন এই সহজ কথাটাও যে জিজ্ঞাসা করবার বিষয় সে আমাদের মনেও হয়নি। কিন্তু ছোটো বড়ো সহজ কঠিন সকল ব্যাপারেরই জবাব আদায় করার কাজে আছে বিজ্ঞান। পাকাচুল সাদা বলেই সাদা, আমাদের বুদ্ধি এতদিন এই ফাঁকি দিয়েই মনকে ঠাণ্ডা রেখেছিল। বিজ্ঞান বললে উত্তরটা আরামজনক হোতে পারে কিন্তু সন্তোষজনক নয়। বুড়োর মাথায় কী কাণ্ডটা যে ঘটে তবে চুল সাদা হয়ে প্রকাশ পায় তার খোঁজ করতে বুদ্ধিকে দৌড় করাতে হয় প্রায় সাড়ে নয় কোটি মাইল দূরে, সেখানে অতি প্রকাণ্ড অতি প্রচণ্ড আগ্নেয় গ্যাসের উৎস থেকে যে তেজের ধারা চলে আসছে সেটা বুড়োর চুলে এসে ঠেকে গেল, প্রতি মুহূর্তে তার থেকে ফিরে আসতে আসতে সেই ফিরতি আলোয় চুল দেখতে হোলো সাদা। কেন তাকে ফেরায় তা জানিনে। কিন্তু এই অতি সামান্য ঘটনাটা বিশ্বের কত বড় ঘটনার সঙ্গে নিত্যই যোগযুক্ত সে কথা ভাবলে অবাক হয়ে থাকতে হয়। জগতে এমন কিছুই নেই যা সকলের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে আপনা-আপনিই ঘটছে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যার হিসাব মেলে না।

সূর্যকিরণের সঙ্গে জড়ানো এমন অনেক ঢেউ আছে, যারা অতি অল্প পরিমাণে আসে ব'লে অনুভব করতে পারিনে। এমন ঢেউও আছে যারা প্রচুর পরিমাণেই নেমে আসে, কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল তাদের আটক করে। নইলে জ্বলে পুড়ে মরতে হোত। সূর্যের যে পরিমাণ দান আমরা

সইতে পারি প্রথম থেকেই তাই নিয়ে আমাদের দেহতন্ত্রের বোঝাপড়া হয়ে গেছে। তার বাইরে আমাদের জীবযাত্রার কারবার বন্ধ।

বিশ্বছবিতে সব চেয়ে যা আমাদের চোখে পড়ে সে হোলো নক্ষত্রলোক, আর সূর্য, সেও একটা নক্ষত্র। মানুষের মনে এতকাল এরা প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। বর্তমান যুগে সব চেয়ে মানুষকে আশ্চর্য করে দিয়েছে এই বিশ্বের ভিতরকার লুকানো বিশ্ব, যা অতি সূক্ষ্ম, যা চোখে দেখা যায় না, অথচ যা সমস্ত সৃষ্টির মূলে।

একটা মাটির ঘর নিয়ে যদি পরখ করে বের করতে চাই তার গোড়াকার জিনিসটা কী, তাহোলে দেয়ালে পাওয়া যাবে ধুলোর কণা। যখন তাকে আর গুঁড়ো করা চলবে না তখন বলব এই সূক্ষ্ম ধুলোই মাটির ঘরের আদিম মালমসলা। তেমনি করেই মানুষ একদিন ভেবেছিল, বিশ্বের পদার্থ-গুলিকে ভাগ করতে করতে যখন এমন সূক্ষ্মে এসে ঠেকবে যে তাকে আর ভাগ করা যাবে না তখন সেইটেকেই বলব বিশ্বের আদিভূত, অর্থাৎ গোড়াকার সামগ্রী। আমাদের শাস্ত্রে তাকে বলে পরমাণু, য়ুরোপীয় শাস্ত্রে বলে অ্যাটম। এরা এত সূক্ষ্ম যে দশকোটি পরমাণুকে পাশাপাশি সাজালে তার মাপ হবে এক ইঞ্চি মাত্র।

সহজ উপায়ে ধুলোর কণাকে আর আমরা ভাগ করতে পারিনে কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাড়নে বিশ্বের সকল সামগ্রীকে আরো অনেক বেশি সূক্ষ্মে নিয়ে যেতে পেরেছে। শেষকালে

এসে ঠেকেছে বিরেনব্বইটা অতি সূক্ষ্ম বস্তুতে। পণ্ডিতেরা বললেন এদেরই যোগ বিয়োগে জগতের যত কিছু জিনিস গড়া হয়েছে, এদের সীমান্ত পেরোবার জো নেই।

মনে করা যাক মাটির ঘরের এক অংশ তৈরি খাঁটি মাটি দিয়ে, আর এক অংশ মাটিতে গোবরে মিলিয়ে। তাহোলে দেয়াল গুঁড়িয়ে দুরকম জিনিস পাওয়া যাবে, এক বিশুদ্ধ ধুলোর কণা, আর এক ধুলোর সঙ্গে মিশানো গোবরের গুঁড়ো। তেমনি বিশ্বের মূল জিনিস পরখ করে বিজ্ঞানীরা তাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, এক ভাগের নাম মৌলিক, আর এক ভাগের নাম যৌগিক। মৌলিক পদার্থে কোনো মিশেল নেই, আর যৌগিক পদার্থে এক বা আরো বেশি জিনিসের যোগ আছে। সোনার পরমাণু মৌলিক, ওকে যত সূক্ষ্ম ভাগ করো সোনা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। জল যৌগিক, ওকে ভাগ করলে দুটো মৌলিক গ্যাস বেরিয়ে পড়ে, একটার নাম অক্সিজেন আর একটার নাম হাইড্রোজেন। এই দুটি গ্যাস যখন স্বতন্ত্র থাকে তখন তাদের এক রকমের গুণ, আর যেই তারা মিশে হয় জল, তখনি তাদের আর চেনবার জো থাকে না, তাদের মিলনে সম্পূর্ণ নতুন স্বভাব উৎপন্ন হয়। যৌগিক পদার্থ মাত্রেরই এই দশা। তারা আপনার মধ্যে আপন আদি-পদার্থের পরিচয় গোপন করে। যা হোক এই সব অ্যাটম পদবী-ওয়ালারাই একদিন খ্যাতি পেয়েছিল জগতের মূল উপাদান ব'লে; সবাই বলেছিল, এদের ধাতে আর একটুও ভাগ সয়

না। কিন্তু শেষকালে তারো ভাগ বেরল। যাকে পরমাণু বলা হয়েছে তাকেও ভাঙতে ভাঙতে ভিতরে যা পাওয়া গেল সে এক অপরূপ জিনিস, তাকে জিনিস বলতেও মুখে বাধে। বুঝিয়ে বলা যাক।

আজকাল ইলেক্‌ট্রিসিটি শব্দটা খুব চলতি—ইলেক্‌ট্রিক বাতি, ইলেক্‌ট্রিক মশাল, ইলেক্‌ট্রিক পাখা এমন আরো কত কী। সকলেরই জানা আছে ওটা একরকমের তেজ। এও সবাই জানে মেঘের মধ্যে থেকে আকাশে যা চমক দেয় সেই বিদ্যুৎও ইলেক্‌ট্রিসিটি ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিদ্যুৎই পৃথিবীতে আমাদের কাছে সব চেয়ে প্রবল প্রতাপে ইলেক্‌ট্রিসিটিকে, আলোয় এবং গর্জনে ঘোষণা করে। গায়ে লাগলে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। ইলেক্‌ট্রিসিটি শব্দটাকে আমরা বাংলায় বলব বৈদ্যুত।

এই বৈদ্যুতের কণা অতি সূক্ষ্ম, আমাদের ধারণার অতীত, প্রত্যেক পরমাণুতে এদের একটি করে দল বাঁধা। এই বৈদ্যুত কণিকার দল কতকটা যেন সৌরমণ্ডলের মতো, যেন এক একটি অণুতম জগৎ। মাঝখানে আছে একটি বা একটির বেশি কণিকা, আর তারি চারদিকে ঘুরছে আরো কতকগুলি কণিকা, অদ্ভুত দ্রুতবেগ তাদের। এই প্রদক্ষিণকারী কণিকাগুলির আচরণটা আমাদের পৃথিবীর মতো; তারা লাঠিমের মতো ঘুরপাক খেতে খেতে চক্রপথে ঘুরে আসছে কেন্দ্রবস্তুর চারদিকে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে ইলেকট্রন। জগতে সব চেয়ে হাল্‌কা যে পরমাণু

সে হাইড্রোজেন গ্যাসের। যে বৈদ্যুতমণ্ডলীকে নিয়ে সে তৈরি তাতে আছে একটিমাত্র ইলেক্‌ট্রন, আর তার কেন্দ্রবস্তুটিও একা, তার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটন। এই দুই একায় মিলে যে নিরন্তর চাঞ্চল্য তাকেই বলে হাইড্রোজেন গ্যাস। বিশ্ব উপাদানের অন্য সকল পরমাণুই হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে ভারি। তাদের বৈদ্যুত লোকের কেন্দ্রে একেশ্বর প্রোটনের রাজত্ব নয়। তাদের ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা বেশি, এবং এই ইলেক্‌ট্রনের দলকে বেঁধে চালাবার জন্যে কেন্দ্রে থাকে একাধিক প্রোটন এবং তাদের সঙ্গে থাকে আর একটা পদার্থ তাদের কথা পরে বলব।

পূর্বেই বলেছি, এই বিশ্ব গড়ে তুলতে ৯২টি মূল পদার্থ লেগেছে। যদি তাদের সকলেরই পরমাণু একই বৈদ্যুতকণিকা দিয়ে তৈরি হয়, তাহোলে তাদের প্রভেদ কী নিয়ে। প্রভেদটা কেবল সংখ্যা নিয়ে, কারো দলে কণা বেশি কারো দলে কণা কম। পরমাণুর অন্তর্গত ইলেক্‌ট্রনদের প্রত্যেকের প্রদক্ষিণপথ নির্দিষ্ট সীমানায় বাঁধা আছে। সোনা যে সোনা তার কারণ শুধু এ নয় যে তার পরমাণুতে উনআশিটি ইলেক্‌ট্রন ঘুরে বেড়ায়। সেই উনআশিটি ইলেক্‌ট্রনের ঘুরে আসার নির্দিষ্ট পথ আছে। এই জগৎটা অন্যরকম কিছু হোত, যদি পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনদের চলার পথ হোত অন্য পথ। জন্মকাল থেকে মানুষ নামক প্রাণীকে শিশুকাল থেকে চালিয়ে বেড়ায় অন্নের ক্ষুধায়, মনে করো যদি অন্ন না হয়ে তাকে চালিয়ে বেড়াত গানের সুরের ক্ষুধায় তাহোলে তার

চলন হোত যে পথে, আর তার সমাজের আকার হোত যে রকমের আজ তা কল্পনা করাই কঠিন। অণুপরমাণুর চাল চলনের গোপন কথা যখন ধরা পড়ে তখন দেখতে পাই তার পথের এবং চলার বিশেষত্বই জগতের আকৃতি প্রকৃতির বিশেষত্ব। মানুষের স্বভাবেরও রূপবৈচিত্র্য তার চলার পথ এবং চলার প্রকার ভেদে।

এই ইলেক্‌ট্রন প্রোটনের স্বতন্ত্র প্রকৃতি সম্বন্ধে আরো কিছু বলবার আছে। এইখানে সেটা শেষ করে দিই।

জগতে বস্তুমাত্রই বৈদ্যুতের পুঞ্জ। আর কিছুই নয়। এই বৈদ্যুতের দুই শ্রেণী, তাদের দু'রকমের স্বভাব। এক শ্রেণীকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন পজিটিভ অন্যটিকে নেগেটিভ। তর্জমা করলে বোঝাবে একটা হাঁ-ধর্মী আর একটা না-ধর্মী। নাম দুটোর খুব যে সার্থকতা আছে বলতে পারিনে। এইটুকু বলা যায় এদের মেজাজ পরস্পরের বিপরীত। এই দুই বৈদ্যুতের সঙ্গে ইতিমধ্যে আমাদের পরিচয় হয়ে গেছে। নেগেটিভ বৈদ্যুতকণাই ইলেক্‌ট্রন। নেগেটিভ অর্থাৎ না-ধর্মী বৈদ্যুত হাল্‌কা চটুল চঞ্চল; পজিটিভ বৈদ্যুতের ভার বেশি, নইলে সে আপন দলের নেগেটিভ ইলেক্‌ট্রনদের আয়ত্তে রাখতে পারে না। পজিটিভ প্রোটন আপন দায়িত্ব নিয়ে রাশভারি। এদের বিশেষ লক্ষণ এই যে, একটা পজিটিভ বৈদ্যুতকণা স্বশ্রেণীর আর একটি বৈদ্যুতকণাকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না, তারা পরস্পরকে এড়িয়ে চলে।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে পরমাণু-লোকে প্রোটন ইলেক্‌ট্রন ছাড়াও আর একটি অতিপরমাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে যা হাঁ-ধর্মী ইলেক্‌ট্রন, যার ওজন ও বৈদ্যুতের পরিমাণ সাধারণ ইলেক্‌ট্রনেরই সমান, এর নাম দেওয়া হয়েছে পজিটন। পূর্বে বলা হয়েছে সব চেয়ে হাল্‌কা হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে একটিমাত্র প্রোটন এবং তার চারিদিকে ঘুরছে একটি ইলেক্‌ট্রন। অন্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি অপেক্ষাকৃত কম বেশি ভারি। ভার অনুসারে তাদের কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা বেশি। এই প্রোটনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আর একজাতের অতিপরিমাণু তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ন্যুট্রন। মনে করা যাক হাইড্রোজেনের পরমাণুর ভিতরে হঠাৎ তার ইলেক্‌ট্রনটি প্রোটনের গায়ে লেগে গেছে; এতে যে জিনিসের সৃষ্টি হবে তাকেই আমরা ন্যুট্রন বলে মেনে নিতে পারি। এর ওজন হবে প্রোটনের সমান কিন্তু ধর্ম বদলাবে। অর্থাৎ বৈদ্যুতের ধর্ম আর এতে প্রকাশ পাবে না। ন্যুট্রনরা সাম্যধর্মী অর্থাৎ হাঁ-ধর্মীও নয়, না-ধর্মীও নয়: তারা না নেগেটিভ না পজেটিভ। বস্তুত সমস্ত পরমাণুর প্রায় সমগ্র ওজনটা এই প্রোটন ন্যুট্রনে মিলিত কেন্দ্রবস্তুতেই জমা হয়ে আছে। ইলেক্‌ট্রনের ওজনটা গণ্যের মধ্যেই নয়। এই ইলেক্‌ট্রনগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের কেন্দ্রবস্তুর থেকে যথেষ্ট দূরে। দূর শব্দটা শুনে ভুল বুঝলে চলবে না। পরমাণু অধিকার করে আছে যে আকাশকে সে আমাদের দৃষ্টির অতীত। কিন্তু তার মধ্যেও দূরত্বের

প্রভৃত কমি বেশি আছে। ইতিপূর্বে নক্ষত্রলোকে বৃহত্ত্বের অতি প্রকাণ্ডতার কথা বলেছি। কিন্তু অত্যন্ত ছোটোকেও বলা যেতে পারে অতি প্রকাণ্ড ছোটো। বৃহৎ প্রকাণ্ডতার সীমাকে সংখ্যা চিহ্ন দিয়ে ঘের দিতে গেলে যেমন একের পিছনে বিশ বাইশটা অঙ্কপাত করতে হয়, ক্ষুদ্রতম প্রকাণ্ডতা সম্বন্ধে সেই একই কথা; দুইই আমাদের ধারণাশক্তিকে হয়রান করে দেয়। একটা গল্প বানিয়ে লেখা যেতে পারে যে অ্যান্টারস নামক অতি বিপুলায়তন নক্ষত্রে এমন মহাকায় বুদ্ধিমান জীব আছে আমাদের সৌর জগৎ যাদের কাছে একটি পরমাণু; যারা অতি প্রবল শক্তিশালী অণুবীক্ষণ বানিয়ে তবে সৌরজগৎকে দেখতে পাচ্ছে। অণুবীক্ষণের শক্তি আরো অনেক গুণ বাড়িয়ে তাদের চোখে পড়ল মানুষের চলাফেরা। এই সব খুদে খুদে মানুষের সমাজ সাম্রাজ্য বাণিজ্য যুদ্ধ প্রভৃতি দেখে সেই নক্ষত্রবাসীরা কী যে মনে করছে সেই রহস্য বর্ণনার ফরমাস কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়ের উপর ভার দিয়ে আসল কথায় ফিরে যাওয়া যাক। একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী, পরমাণুর অতি সূক্ষ্ম আকাশে যে-দূরত্ব অধিকার ক'রে ইলেকট্রনরা চলাফেরা করছে তার একটি উপমা কল্পনা করেছেন। তিনি বলেন হাওড়া স্টেশনের মতো মস্ত একটা স্টেশন থেকে অন্য সমস্ত জিনিসই বের করে ফেলে দিয়ে যদি কেবল গোটা পাঁচ ছয় বোলতাকে উড়ে বেড়াতে দেওয়া হয় তবে তারই সঙ্গে তুলনা হোতে পারে

একটি পরমাণুর আকাশস্থিত ইলেক্‌ট্রনদের। কিন্তু এই অতি ব্যাপক শূন্যের মধ্যে দূর দূরবর্তী কয়েকটা চঞ্চল পদার্থকে আটকে রাখবার জন্যে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুর সমস্ত ভার সমস্ত শক্তি কাজ করছে। এ না হোলে পরমাণু জগৎ ছারখার হয়ে যেত এবং পরমাণু দিয়ে গড়া বিশ্বজগতের অস্তিত্বই থাকত না।

বিজ্ঞানীদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে ন্যুট্রনের আবির্ভাব হয়েছে অতি সম্প্রতি। এমন সর্বদাই চলছে। এই বইখানি পড়া শেষ হোতে না হোতে পরমাণুর আরো হয়তো অনেক নূতন খবর বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু পরমাণুর যে স্বরূপরহস্য জানা গেল আপাতত সেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

পরমাণুদের মধ্যে দুই জাতের বৈদ্যুতের জুড়ি মিলেছে যেন অর্ধনারীশ্বর, তবেই হয়েছে স্থিতি, হয়েছে শান্তি, বিচ্ছেদ হোলেই সর্বনাশ।

পজিটিভ বৈদ্যুতকণা অর্থাৎ প্রোটন স্বজাতীয়ের সঙ্গে বিরোধ করে, তারা পরস্পরকে এড়িয়ে চলে যায় এমন একটা অপবাদ আছে। মোটের উপরে এই কথাটার প্রমাণ পাওয়া যায়, আবার দেখি বিরুদ্ধ প্রমাণও মেলে। হেলিয়ম নামক গ্যাসের যে কেন্দ্রবস্তু তাকে বলে আল্‌ফা-কণা। এই আল্‌ফা-কণার মধ্যে দুটি পজিটিভ বৈদ্যুত মিল করে আছে, এতই ঘনিষ্ঠ মিল যে আজ পর্যন্ত কোনো কৃত্রিম উপায়ে এই জুড়ির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব হয় নি। ভারি পরমাণুদের কেন্দ্রবস্তুতে বহুসংখ্যক প্রোটন তাদের ন্যুট্রন সহচরদের

নিয়ে ইলেক্‌ট্রনদের শাসনকার্য চালাচ্ছে তাদের রাষ্ট্রসভায় তো ঝগড়া চলছে না। এই কথাটি যখন লিখছি এমন সময় আমেরিকা থেকে একটি বৈজ্ঞানিক খবর চোখে পড়ল। তাতে লিখছে, প্রমাণ হয়েছে যে ইলেক্‌ট্রন প্রোটনদের অতিরিক্ত আর একটা অতি বলবান বৈদ্যুত শক্তি পরমাণুর মধ্যে রয়েছে যা ঝগড়াটে পদার্থগুলোকে এক করে রাখে, তাই পরমাণুর শাসনবিভাগে পাগলামি ঘটতে পারে না। আধুনিক ইতিহাস থেকে একটা উপমা সংগ্রহ করে দেওয়া যাক। চীন রিপব্লিকের শান্তি নষ্ট ক'রে কতকগুলি একাধিপত্যলোলুপ জাঁদরেল পরস্পর লড়াই ক'রে দেশটাকে ছারখার করে দিচ্ছিল। রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে এই বিরুদ্ধদলের চেয়ে প্রবলতর শক্তি যদি থাকত তাহোলে শাসনের কাজে এদের সকলকে এক করে রাষ্ট্রশক্তিকে বলিষ্ঠ ও নিরাপদ করে রাখা সহজ হোত। পরমাণুর রাষ্ট্রতন্ত্রে সেই বড়ো শক্তি আছে সকল শক্তির উপরে, তাই যারা স্বভাবত মেলে না, তারাও মিলে বিশ্বের শান্তি রক্ষা হচ্ছে। এর থেকে দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের শান্তি পদার্থটি ভালোমানুষি শান্তি নয়। যত সব দুরন্তদের মিলিয়ে নিয়ে তবে একটা প্রবল মিল হয়েছে। যারা স্বতন্ত্রভাবে সর্বনেশে তারাই মিলিতভাবে সৃষ্টির বাহন।

এইখানে বলে রাখি প্রোটন ইলেক্‌ট্রনের টানটা সাধারণ ভারাকর্ষণের টান নয়, এদের টানকে বলে বৈদ্যুতিক টান। এই টানে হাল্‌কা ইলেক্‌ট্রনের চঞ্চলতা বেড়ে ওঠে, কিন্তু

প্রোটনের ভার বেশি বলে ইলেকট্রনের নিরন্তর নৃত্যে সমান তালে সে যোগ দিতে পারে না।

যেমন দেখা গেল প্রোটনে প্রোটনে যখন অত্যন্ত কাছে এসেছে তখন আর একটা জোরালো শক্তি তাদের বিরোধ ভঞ্জন করে সৃষ্টি রক্ষা করছে, তেমনি পজিটিভ নেগেটিভ বৈদ্যুতের স্বাতন্ত্র্যকে মিলিয়ে দিয়ে বিশ্বে এমন একটি শান্তি স্থাপনা হয়েছে যে শান্তি না থাকলে সৃষ্টির ভিৎ যেত চুরমার হয়ে। এই কলমটাকে দেখো। এটি ভরপুর দুই বিরুদ্ধ বৈদ্যুতে; তারা আছে নিজেদের মধ্যে আপস করে। সেই-জন্যেই যুগলের মিলন কলম রূপ ধরে ঠাণ্ডা হয়ে আছে। সেইজন্যে ঐ কলমটা বাইরের শান্তিও নষ্ট করছে না। দুই বৈদ্যুত আপন দুর্দান্ত শক্তিকে পরস্পর এমনি মিলিয়ে দিয়েছে যে মৈত্রীভাবের কাছে তাদের শক্তি-ভাব গেছে শান্ত হয়ে। শক্তিটা সৃষ্টিকার্যে যেন ঐ সামান্য কলমটাকেই মানলে, আর নিজেকে রেখে দিলে ঢাকা দিয়ে।

কোনো একটা বস্তু থেকে কোনো একটা জাতের বৈদ্যুতকে ষোলো আনা সরিয়ে দিতে অতি বিপুল শক্তির দরকার। কিন্তু সামান্য পরিমাণ নেগেটিভ বৈদ্যুত কোনো জিনিস থেকে সরিয়ে নেওয়া শক্ত নয়। পজিটিভে নেগেটিভে যথা-পরিমাণে মিলে যেখানে বেশ সন্ধি করে আছে সেখানে যদি কোনো উপায়ে গৃহবিচ্ছেদ ঘটানো যায়, গুটিকতক নেগেটিভকে দেওয়া যায় তফাৎ করে, তাহোলে সেই জিনিসে বৈদ্যুতের হিসাবের হবে ব্যতিক্রম, সমগ্রের যথোচিত ওজন

ছাড়িয়ে অতিরিক্ত প্রধান হয়ে পড়বে পজিটিভ বৈদ্যুতের চার্জ।

এই চার্জ কথাটা ইলেক্‌ট্রিসিটির প্রসঙ্গে সর্বদাই ব্যবহারে লাগে। সংক্ষেপে এর অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া যাক। যে বস্তু চার্জ করা নয় তাদের মধ্যে দুই-জাতেরই বৈদ্যুত প্রচুর বটে কিন্তু তাদের সামঞ্জস্য আছে অক্ষুব্ধ। ওজনের অসাম্য নিয়ে মিলন নৃত্যের তাল কাটা যায় নি। কোনো জিনিসকে চার্জ-করা মানে তার ভিতরকার বৈদ্যুতের তৌলসাম্য কিছু পরিমাণে নষ্ট করা।

এক টুকরো রেশম নিয়ে কাঁচের গায়ে ঘষা গেল। সেই সংঘর্ষে কাঁচের থেকে কিছু ইলেক্‌ট্রন ছিনিয়ে নিয়ে রেশমে হোলো চালান। তাতে কাঁচে সেই পরিমাণ নেগেটিভ ইলেক্‌ট্রন ক'মল, সুতরাং বাড়াবাড়ি হোলো পজিটিভ বৈদ্যুতের। অপরপক্ষে রেশমে বেহিসাবি ইলেক্‌ট্রন জমে উঠে সেদিকে নেগেটিভ চার্জ ঘটিয়ে দিলে, অর্থাৎ সামঞ্জস্য-হারা নেগেটিভ অধিক করে মাথা তুলল। কাঁচ বা রেশমে বৈদ্যুতের যখন সাধারণতন্ত্র অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন তারা আপনাতে আপনি ছিল সহজ, ছিল শান্ত। অসামঞ্জস্য যেই ঘটল চাঞ্চল্য প্রকাশ হয়ে পড়ল বাইরে। ইলেক্‌ট্রন-খোয়ানো কাঁচ তার তৌলসাম্যভাঙা পজিটিভ চার্জ নিয়ে টানতে চাইল নেগেটিভ-ভরা রেশমকে, আবার নেগেটিভের ভিড়বাহুল্য নিয়ে রেশমের টান পড়ল কাঁচের দিকে। শান্ত অবস্থায় এদের মধ্যে বৈদ্যুতের অস্তিত্ব জানাই যায়নি। বাইরে

থেকে জানা গেল, যখন ভাগাভাগির অসমানতায় ক্ষোভ ঘটিয়ে দিলে।

এই অতিপরমাণুদের কথা তো বারবার বলে আসা গেল। এরা যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম তা বলা হয়েছে মাত্র, একটা দৃষ্টান্ত দিলে তাদের একটা ধারণা জন্মাবার সামান্য একটু সাহায্য হোতে পারে। কাঁচ কিম্বা অন্য কিছুর থেকে ঘষাঘষির দ্বারা অল্প পরিমাণে ইলেক্‌ট্রন সরিয়ে নেবার কথা বলেছি। সেই পরিমাণটা কত, বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি সামান্য একটু ঘাড় নেড়ে বলবেন ঘষড়ানির মাত্রা অনুসারে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট কোটি হোতে পারে। বিজ্‌লিবাতির সল্‌তে-তারের ভিতর দিয়ে ইলেক্‌ট্রনের ঠেসাঠেসি ভিড় চলতে থাকে তবে সে জ্বলে। তারের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে যতগুলি ইলেক্‌ট্রন যাত্রা ক'রে চলে, আমাদের গণিতশাস্ত্রে তার কী নাম আছে আমি তো তা জানিনে। এই ইলেক্‌ট্রনের চলার দৌড়ও এমন যে এক সেকেণ্ডেরও কমে পৃথিবীর বিষুবরেখা ঘুরে আসতে পারে। যে উদ্যমে এই চলা সম্ভব হয় তার কিছু অংশ শক্তি যদি পৃথিবীর পরমাণুর মধ্যে থাকত তাহোলে সমস্ত পৃথিবী একটা দীপ্ত গ্যাস হয়ে উঠত আর তার উপাদান পদার্থ সমস্তই ফেটে ফুটে শূন্যে যেত মিলিয়ে। বলা বাহুল্য সহজ অবস্থায় পরমাণুর মধ্যে অতিপরমাণুর এই দুরন্ত চাঞ্চল্য পজিটিভ নেগেটিভে সন্ধি করে শান্ত সংযত হয়ে আছে সেইজন্যেই পৃথিবীতে রয়েছে শান্তি। ভালুকওয়ালা ডুগডুগি বাজাচ্ছে সেই তালে ভালুক নাচছে আর নানা খেলা দেখাচ্ছে,

ডুগডুগিওয়ালা না যদি থাকে পোষমানা ভালুক যদি শিকল কেটে স্বধর্ম পায় তাহোলে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে নখ দিয়ে ছিঁড়ে সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটায়। আমাদের দেহে এবং দেহের বাইরে এই পোষমানা বিভীষিকা নিয়ে অদৃশ্য ডুগডুগির ছন্দে সৃষ্টির নাচ আর খেলা। সৃষ্টির আখড়ায় দুই খেলোয়াড় তাদের ভীষণ দ্বন্দ্ব মিলিয়ে নিয়ে বিশ্বচরাচরের নাট্যশালা সরগরম করে রেখেছে।

পূর্বেই বলেছি এককালের বিজ্ঞানীরা খুব দৃঢ়স্বরেই ঘোষণা করেছিলেন যে, ৯২টি আদিভূত বিশ্বসৃষ্টির মৌলিক পদার্থ। অতিপরমাণুদের সাক্ষ্যে আজ সে কথা অপ্রমাণ হয়ে গেল, তবু এখনো রয়ে গেল এদের সম্মানের উপাধিটা।

একদা মৌলিক পদার্থের একটা খ্যাতি ছিল যে তাদের গুণের নিত্যতা আছে। তাদের যতই ভাঙা যাক কিছুতেই তাদের স্বভাবের বদল হয় না। বিজ্ঞানের নতুন অধ্যায়ে দেখা গেল তাদের চরম ভাগ করলে বেরিয়ে পড়ে দুই জাতীয় বৈদ্যুতের জুড়িনৃত্য। যাদের মৌলিক পদার্থ বলা হয়েছে তাদের স্বভাবের বিশেষত্ব রক্ষা করেছে এই সব বৈদ্যুতেরা বিশেষ সংখ্যায় একত্র হয়ে। এইখানেই যদি থামত তাহোলেও পরমাণুদের রূপনিত্যতার খ্যাতি টিঁকে যেত। কিন্তু ওদের নিজের দলের থেকেই বিরুদ্ধ সাক্ষ্য পাওয়া গেল। একটা কথা দেখা গেল, হাল্‌কা যে সব পরমাণু তাদের মধ্যে ইলেক্‌ট্রন প্রোটনের ঘোরাঘুরি নিত্যনিয়মিতভাবে চলে আসছে। কিন্তু অত্যন্ত ভারি যারা, যাদের মধ্যে ন্যুট্রন

প্রোটন সংঘের অতিরিক্ত ঠেসাঠেসি ভিড়, যেমন য়ুরেনিয়ম বা রেডিয়ম, তারা আপন তহবিল সামলাতে পারছে না, সদা সর্বক্ষণই তাদের মূল সম্বল ছিটকে পড়তে পড়তে হাল্‌কা হয়ে তারা একরূপ থেকে অন্যরূপ ধরছে।

এতকাল লুকিয়েছিল যে রেডিয়ম স্থূল আবরণের মধ্যে, যার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুর গূঢ়তম রহস্য ধরা পড়ে গেল, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তার প্রথম মোকাবিলার ইতিহাস মনে রেখে দেবার যোগ্য।

হাঁরি বেকেরেল ছিলেন প্যারিস ম্যুনিসিপাল স্কুলে বিজ্ঞানের অধ্যাপক। একদিন দৈবক্রমে তিনি তাঁর ল্যাবরেটরির দেরাজের মধ্যে একটুকরো য়ুরেনিয়ম ধাতু একটা ফোটোগ্রাফির প্লেটের উপর রেখে দিয়েছিলেন। হপ্তাদুয়েক পরে সেই প্লেট নিয়ে তিনি তাঁর সহকারীকে দিলেন তার ছবি ফুটিয়ে তুলতে। দেখা গেল সেই প্লেটের মাঝখানটাতে মস্ত খানিকটা আলোর চিহ্ন। ঐ য়ুরেনিয়ম-টুকরো থেকেই অদৃশ্য আলো বিকীর্ণ হয়ে প্লেটে ধরা পড়েছে এটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ না করে তিনি কোনো মত খাড়া করতে রাজি হলেন না। তখন তিনি অন্য পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি অসামান্য বুদ্ধিমতী ছাত্রী মাডাম কুরির উপর ভার দিলেন এই পরীক্ষা সমাধা করতে। সেই মেয়েটি ফরাসি বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে তাঁর স্বামী অধ্যাপক পিয়ের কুরির সহযোগিনী হয়ে পরীক্ষার কাজ করতেন। তাঁরা দুজনে মিলে এই অজানা ধাতুর খোঁজ খবর নিতে লেগে গেলেন। যথেষ্ট টাকার

দরকার। ধার করতে কুণ্ঠিত হলেন না। অস্ট্রিয়া থেকে সাতাশ মোন এক ধাতুপিণ্ড কিনে আনলেন, এটাকে বলে পিচ্‌ব্লেণ্ড; য়ুরেনিয়মের একটি বিমিশ্র খনিজ পদার্থ। শোধনের এবং বিশ্লেষণের কাজে লেগে গেলেন। ভোরবেলা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতে করতে বৎসর পেরিয়ে গেল। সাংসারিক বাধাও অনেক ঘটল। অবশেষে পরীক্ষার প্রণালীতে খনিজটা খয়ে খয়ে প্রায় যখন আণুবীক্ষণিক সূক্ষ্মতায় এসে ঠেকল, তখন একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁদের কর্মশালায় ঢুকে দেখলেন সেই পরীক্ষাবশিষ্ট পদার্থ থেকে দীপ্তি দেখা দিচ্ছে। এই উজ্জ্বল পদার্থটির মধ্য হতে মাডাম কুরি কয়েকটি বিশুদ্ধ রেডিয়মের দানা বের করে নিলেন। আরো পাঁচ বছর ধবে সন্ধান ও আলোচনা করে অবশেষে রেডিয়ম সম্বন্ধে তাঁর রচনাটি পরীক্ষক সমিতির হাতে দিলেন। অবিলম্বে জগতে ঘোষিত হোলো এই অপূর্ব বিস্ময়ের খবর। তখনকার দিনে সকলের চেয়ে যেটা চমক লাগিয়ে দিল সেটা হচ্ছে, এই ধাতুর একটি অদ্ভুত স্বভাব, সে নিজের মধ্যে থেকে জ্যোতিষ্কণা বিকীর্ণ করে নিজেকে নানা মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করতে করতে অবশেষে সীসে করে তোলে। এ যেন একটা বৈজ্ঞানিক ভেলকি বললেই হয়। এক ধাতু থেকে অন্য এক ধাতুর যে উদ্ভব হোতে পারে, সে এই প্রথম জানা গেল।

তার পরে ক্রমে এই প্রমাণ হয়েছে যে, পরমাণুর প্রোটন ন্যুট্রনের কেন্দ্রপিণ্ডটিতে যতক্ষণ কোনো লোকসান না ঘটে

ততক্ষণ পরমাণু আপনার বিশেষত্ব বজায় রাখে। তার সীমান্ত থেকে ক্ষণকালের জন্যে দুটো একটা ইলেকট্রন অর্থাৎ নেগেটিভ বৈদ্যুত যদি সরিয়ে নেওয়া যায় তাহোলে সেই পরমাণুর নেগেটিভ পজিটিভের বাঁধা হিসাবে গরমিল ঘটে—সুতরাং সেটা পজেটিভপ্রধান হয়ে ওঠে; তবু তার বিশিষ্টতা একান্ত মারা যায় না। কিন্তু পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুটিতেই যদি কিছু লোকসান ঘটানো যায়, তাহোলে তার নিজত্ব যায় ভেঙে, তার থেকে অন্য একটা নূতন পদার্থের উদ্ভব হয়। রেডিয়মের মতো তেজস্ক্রিয় (ইংরেজিতে বলে radio-active) পদার্থে এই ব্যাপারটি স্বতই ঘটছে। সে আপন মূলধন কেবলি ছড়িয়ে ফেলছে। তাতে করে তার মূলেই বদল হয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানী মহলে কৃত্রিম উপায়ে পরমাণুর কেন্দ্রসম্বলে দস্যুবৃত্তির চেষ্টা চলেছে। বহুচেষ্টায় মাঝে মাঝে এক আধবার একটু আধটু লক্ষ্যভেদ হোতে পেরেছে। লক্ষ্যটি এতই অতিমাত্র ছোটো যে, অসংখ্য বিদ্যুৎবাণ বর্ষণ করতে করতে দৈবাৎ কখনো সামান্য একটু ফল পাওয়া যায়। যথেষ্ট পরিমাণে যখন পরমাণুর তহবিলভাঙা সম্ভব হবে তখন প্রয়োজন মতো এক ধাতু থেকে অন্য ধাতুর সৃষ্টি বাজারে চলতে পারবে।

এক টুকরো রেডিয়মকে কাঁচের পাত্রে আটক করা যাক। দেখা যাবে এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে দুটি স্বতন্ত্র সূক্ষ্ম গ্যাস, তাদের কিছুতে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। এদের ফিরিয়ে নিয়ে আবার সাবেক রেডিয়মে মিলিয়ে দেওয়া

একেবারে অসাধ্য। এক রকম ঘড়ি তৈরি হয়েছে, তার কাঁটায় অল্প পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ছোঁওয়া দেওয়া হয়। তাই সে অন্ধকারে জ্বলে। আতশ কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখলে দেখা যায় বিন্দু বিন্দু আলো তার ভিতর থেকে লাফ দিয়ে দিয়ে বেরচ্ছে। এই লাফ-মারা জ্যোতির কণিকার নাম আল্‌ফা কণিকা। এটি হেলিয়ম গ্যাসের কেন্দ্রবস্তু। কিন্তু জ্যোতিটাই স্বয়ং আল্‌ফা-কণা নয়। আল্‌ফা-কণা এত ছোটো ও এত প্রচণ্ড গতি যে চোখে দেখা অসম্ভব। কিন্তু তার দুর্দাম গতি হাওয়ার মধ্যে দিয়ে ছোটবার সময় হাওয়ার পরমাণুতে উপদ্রব ঘটিয়ে এবং তার জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিলে একটা উজ্জ্বল রেখা এঁকে দেয়। সেইটে আল্‌ফাকণার পথের চিহ্নমাত্র। পূর্বেই বলেছি আল্‌ফাকণা প্রোটনকণা, পজিটিভ বৈদ্যুত। এরা লক্ষ লক্ষ পরমাণুর ভিড় ভেদ করে অবাধে চলে যায়। এই মনে করো হাইড্রোজেন গ্যাস, তার পরমাণুদলের মধ্য দিয়ে আল্‌ফা-কণিকার দ্রুতবেগে বর্ষণ লাগানো গেল। হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল কোথায় যেন একটা বাধা পেলে। ফোটোগ্রাফের প্লেটে ছবি উঠল, আল্‌ফা কণিকা একপাশে ঠিকরে গেছে সোজাপথ থেকে, আর বাধা বস্তুটাকেও বিপরীত পাশে খানিকটা ঠিকরিয়ে দিয়েছে। ফোটোগ্রাফের প্লেটে পড়ল দুইশাখাওয়ালা আলোর চিহ্ন। এর থেকে বোঝা গেল হাল্‌কা ইলেক্‌ট্রন কণাগুলোর মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আল্‌ফাকণা নিজের অনুরূপ একটা ভারি জিনিসে এসে ধাক্কা খেয়েছে, নিজেও

সরেছে তাকেও সরিয়েছে। এই ভারি জিনিসটাই সকল পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে, এই হচ্ছে প্রোটন কণিকা। দুই শাখার যে ছবি বেরিয়েছে তার একটা শাখা স্বয়ং আল্‌ফা কণিকার, আর একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর অন্তর্গত সেই ঠেলা-খাওয়া প্রোটনের।

এবার আর এক রকম শাখায়িত ছবির কথা বলি। সিধে পথে ছুটেছে একটি আল্‌ফা কণিকা, ফোটোগ্রাফ ফলকের উপর তার আলো রেখার একটি লম্বা বোঁটার মতো দাগ পড়ল, সেই বোঁটার একপাশ দিয়ে একটা শাখা বেরোলো সেটা কিছু লম্বা এবং সরু, অন্যপাশের শাখাটি বেঁটে এবং মোটা। লম্বা সরু শাখাটি হাইড্রোজেনের প্রোটনের চিহ্ন, আর অন্যটি অক্সিজেনের। যে গ্যাসের আধারের মধ্যে আল্‌ফা কণিকা ছুটেছিল সেখানে ছিল কেবলমাত্র নাইট্রোজেন। এই নাইট্রোজেনের কেন্দ্রবস্তুতে গিয়ে পড়ল আল্‌ফাকণিকা, সেই ধাক্কা খেয়ে নাইট্রোজেন পরমাণুর প্রোটন সংস্থিতি গেল নড়ে, তার পরমাণুর সত্তা বদল হোলো। সে রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্পে। শুধু আল্‌ফাকণার আঘাতটাই নাইট্রো-জেনের সত্তা বদলে দিয়ে তাকে অক্সিজেনে রূপান্তরিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আল্‌ফাকণার প্রচণ্ড সংঘাতে নাইট্রো-জেনের কেন্দ্রস্থিত প্রোটন থেকে একটি প্রোটন গেল ছিট্‌কে বেরিয়ে। তাকে সরাল বটে কিন্তু নিজে পড়ল আটকা ঐ প্রোটন দলে, তাতে তাদের ওজন গেল বেড়ে, তাদের রূপান্তর

হোলো অক্সিজেনের সমপর্যায়ভুক্ত (isotope of oxygen) একটি গ্যাসে, আর তারি সঙ্গে জেগে উঠল হাইড্রোজেন। মূলে ছিল নাইট্রোজেন গ্যাস, তার কেন্দ্রবস্তু ধাক্কা খেতেই রূপ নিল অন্য দুই গ্যাসের। আপন মূল স্বভাবের এমন পরাভব ঘটবার অপবাদ কয়েক বছর আগে কোনো পরমাণুর প্রতি আরোপ করতে কেউ সাহস করত না।

পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুর দুটি কাজ। যে পরিমাণে বৈদ্যুত-শক্তি থাকলে আপন ইলেকট্রন পরিবারকে আয়ত্তে রাখতে পারে তার জোগাড় রাখা, আর একটি হচ্ছে সমস্ত পরমাণুর যে ভাব প্রায় তার সমস্তটাই ওর নিজের মধ্যে থেকে জোগান দেওয়া। পজিটিভ বৈদ্যুতশক্তি যদি এমন কণাগুলিকে আপন বাহন করত যাদের গুরুত্ব ইলেকট্রনদের গুরুত্বের চেয়ে কম তাহোলে ইলেকট্রনগুলি এতই বেশি দাপাদাপি করত যে তাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় সৃষ্টিতে ঘটত সাংঘাতিক অরাজকতা।

এক সময়ে মানুষ মনে করেছিল বৈদ্যুত পদার্থ কেবল কতকগুলি বিশেষ পদার্থেই ভর করতে পারে অন্যগুলির সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা নেই; দেখতে দেখতে বেরিয়ে পড়ল আদিশক্তি বৈদ্যুত ছাড়া বিশ্বের মূলে আর নেই কিছু। আমার এই দেহটা সচল বৈদ্যুতপুঞ্জ নিয়ে আর সূর্যনক্ষত্রও তাই।

পরমাণুলোকের অনেক কথাই বলা হোলো, কিন্তু সব চেয়ে দূরের, আর সব চেয়ে অন্তর্ভেদী আলোক রহস্যের খবরটা বাকি আছে। সেই আলোর নাম দেওয়া হয়েছে cosmic অর্থাৎ মহাজাগতিক আলো। বিশ্বের কোন্

এক সুদূর প্রান্ত থেকে প্রচণ্ড তেজে জ্যোতিষ্কণা ক্রমাগত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, এরই নাম কস্‌মিক আলো। এর প্রকৃতি সম্বন্ধে দুটি মত প্রচলিত আছে।—অনেকে বলেন যে কস্‌মিক আলো আলোই বটে, রণ্টগেন রশ্মির চেয়েও বহুগুণে জোরালো। আবার অন্য দলের মত এই যে এরা বৈদ্যুতকণা, দুর্দাম এদের বেগ। এত প্রচণ্ড গতি থাকায় এদের কাছে হার মেনেছে মোটা মোটা বাধা। এরা সহজে খুব পুরু সীসের ও সোনার পাত পার হয়ে চলে যায়, তিন চারতলা উঁচু দালান এদের চলার পথে বিশেষ একটা আড়াল দিতে পারে না। কস্‌মিক আলো সম্পূর্ণরূপে বৈদ্যুতকণার সমষ্টি কিনা এ প্রশ্নের আজও শেষ মীমাংসা হয়নি। তবে বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় এটুকু জানা গেছে যে এই আলোর সঙ্গে অনেক বৈদ্যুতকণা মিলিত; পৃথিবীর যে ক্ষেত্রে চৌম্বক-শক্তির জোর বেশি এরা তারি টানে আপন পথ থেকে সরে গিয়ে মেরুপ্রদেশে বেশি জমা হয়, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এ সব বৈদ্যুতকণার পরিমাণের তফাৎ দেখা যায়। এ আলো যদি সাধারণ আলো হোত তাহোলে চৌম্বক ক্ষেত্রে তার চলার পথের ব্যতিক্রম হোত না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন অতি তীব্র আলো ও প্রচণ্ড গতিশীল বৈদ্যুতকণা এই দুয়ের মিলে কস্‌মিক আলোর সৃষ্টি।

এই প্রসঙ্গে ঐ রহস্যময় শক্তির কথা আরো একটু স্পষ্ট করে সংক্ষেপে বলে নিতে চাই। এই শক্তির নাম ম্যাগ্নেটিজ্‌ম, অর্থাৎ চৌম্বক-শক্তি। তোমরা হয়তো দেখে

থাকবে ঘোড়ার খুরের আকৃতিওয়ালা ম্যাগ্নেট অর্থাৎ চৌম্বক-শক্তিসম্পন্ন ধাতুদ্রব্যের কাছে লোহার টুক্‌রো আনলে সেই টুক্‌রোকে ম্যাগ্নেট টেনে নেয়। এই টেনে নেবার অদৃশ্য শক্তিকেই বলে চৌম্বক-শক্তি। পৃথিবী চৌম্বক-শক্তি দ্বারা আবিষ্ট, কিন্তু সেই শক্তি বিশেষভাবে পৃথিবীর মেরুপ্রদেশেই প্রবল। (কম্পাস যন্ত্র নিশ্চয় তোমরা দেখেছ, তার কাঁটার একপ্রান্ত উত্তর এবং অন্য প্রান্ত দক্ষিণের দিকে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে থাকে। কেননা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর প্রবল চৌম্বক আকর্ষণ বিশেষভাবে কাঁটাটাকে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে স্থির করে রাখে।) এই চৌম্বকটানে চলন্ত বৈদ্যুতকণা আপন চলার পথ থেকে সরে আসে।

এখন প্রশ্ন উঠবে এই আলো আসে কোথা থেকে। পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে নীহারিকায় অর্থাৎ যে নাক্ষত্রজগতে আমাদের বাস তার বাইরে কোথাও থেকে এই তীব্র জ্যোতিষ্কণা এসে গুলির মতো নিরন্তর আমাদের ঘা লাগাচ্ছে। অনেকে মনে করেন জীব জগতে ক্রমবিকাশের কাজে এই মারের হাত আছে। এই আলোর উদ্ভব হোলো কী করে তার পাকা খবর আজো জানা সম্ভব হয় নি। অনেকে বলেন যে মহাশূন্যে হাল্‌কা পরমাণু থেকে ভারি পরমাণুর সৃষ্টি চলছে, এই সৃষ্টির কাজে প্রচণ্ড তেজ উদ্ভূত হয়ে কস্‌মিক আলোরূপে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। স্যর জেম্‌স জীন্‌স বলেন যে ইলেক্‌ট্রন প্রোটনের সংঘাতে পদার্থের সম্পূর্ণ বিনষ্টি ঘটে, উদ্ভব হয় প্রচণ্ড তেজের, সেই তেজ

দেখতে পাওয়া যায় কস্‌মিক আলোয়। আবার অন্য বিজ্ঞানীদের মত এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এক আত্মবিপ্লবের ভিতর দিয়ে। প্রচণ্ড তোলপাড়ে পরমাণু সব ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে বৈদ্যুতকণায় পরিণত হয়েছে। সেই আদি বিপ্লবের সাক্ষীরূপে এই সব বৈদ্যুতকণা মানুষের কাছে বিশ্বসৃষ্টি ও তার ভবিষ্যতের রহস্য একদিন প্রকাশ করবে বলেই তাঁরা বিশ্বাস করেন।

কস্‌মিক আলো পরমাণু সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য তথ্য আমাদের গোচর করেছে। খুব ভারি জিনিসের বাধা অতিক্রম করতে গিয়ে এই তীব্র আলো থেকে বহু ইলেক্‌ট্রন পজিট্রনের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন যে অতি তীব্র আলো যখন কোনো ভারি জিনিসের পরমাণুর অত্যন্ত কাছে আসে তখন সেই আলোর হয় বিনাশ ও তার থেকেই সৃষ্টি হয় ইলেক্‌ট্রন পজিট্রনের দল। পদার্থের বিনাশে হয় আলোর সৃষ্টি আবার আলোর বিনাশে হয় পদার্থের সৃষ্টি। এই বিশ্বে আলো, বৈদ্যুতকণা বা অন্য কোনো পদার্থেরই নিত্যতা বলে আর কিছুই রইল না। নিত্য বলে যদি কিছু খ্যাতি পেতে পারে তবে সে কেবল এক আদি জ্যোতি, যা রয়েছে সব কিছুরই মূলে, যার প্রকাশের নানা অবস্থান্তরের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বের এই বৈচিত্র্য।

নক্ষত্রলোক

এই তো দেখা গেল বিশ্বব্যাপী অরূপ বৈদ্যুতলোক। এদেরই সম্মিলনের দ্বারা প্রকাশবান রূপলোক গ্রহনক্ষত্রে।

গোড়াতেই বলে রাখি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আসল চেহারা কী, জানবার জো নেই। বিশ্বপদার্থের নিতান্ত অল্পই আমাদের চোখে পড়ে। তা ছাড়া আমাদের চোখ কান স্পর্শেন্দ্রিয়ের নিজের বিশেষত্ব আছে। তাই বিশ্বের পদার্থগুলি বিশেষ-ভাবে বিশেষরূপে আমাদের কাছে দেখা দেয়। ঢেউ লাগে চোখে, দেখি আলো। আরো সূক্ষ্ম বা আরো স্থূল ঢেউ সম্বন্ধে আমরা কানা। দেখাটা নিতান্ত অল্প, না-দেখাটাই অত্যন্ত বেশি। পৃথিবীর কাজ চালাব বলেই সেই অনুযায়ী আমাদের চোখ কান; আমরা যে বিজ্ঞানী হব প্রকৃতি সে খেয়ালই করেনি। মানুষের চোখ অণুবীক্ষণ ও দূরবীন এই দুইএর কাজই সামান্য পরিমাণে করে থাকে। প্রকৃতি যদি আমাদের চোখে এখনকার চোখের চেয়ে বহুগুণ জোরের অণুবীক্ষণ লাগাত তাহোলে পৃথিবীর সব জিনিসে আমরা দেখতুম অণুপরমাণুর ঘূর্ণি নাচ। বোধের সীমা বাড়লে বা বোধের প্রকৃতি অন্য রকম হোলে আমাদের জগৎটাও হোত অন্য রকম।

বিজ্ঞানীর কাছে সেই অন্য রকমই তো হয়েছে। এতই অন্য রকমের, যে, যে-ভাষায় আমরা কাজ চালাই এ জগতের

পরিচয়ে তার অনেকখানিই কাজে লাগে না। প্রত্যহ এমন ভাষা তৈরি করতে হচ্ছে যে, সাধারণ মানুষ তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারে না।

একদিন মানুষ ঠিক করেছিল বিশ্বমণ্ডলের কেন্দ্রে পৃথিবীর আসন অবিচলিত, তাকে প্রদক্ষিণ করছে সূর্যনক্ষত্র। মনে যে করেছিল, সে জন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না,—সে দেখেছিল পৃথিবী-দেখা সহজ চোখে। আজ তার চোখ বদলেছে, বিশ্ব-দেখা চোখ বানিয়ে নিয়েছে। প্রকাশ হয়ে পড়েছে পৃথিবীকেই ছুটতে হয় সূর্যের চারদিকে, দরবেশি নাচের মতো পাক খেতে খেতে। পথ সুদীর্ঘ, লাগে প্রায় ৩৬৫ দিন। এর চেয়ে বড়ো পথওয়ালা গ্রহ আছে, তারা ঘুরতে এত বেশি সময় নেয় যে ততদিন বেঁচে থাকতে গেলে মানুষের মান্ধাতার পরমায়ু দরকার হবে।

(পৃথিবী শব্দটার মানে হচ্ছে—মস্ত বড়ো। এ শব্দটি যখন বানানো হয়েছিল সেদিন কেউ কল্পনা করতে পারত না যে সমগ্র বিশ্বের তুলনায় পৃথিবী এত ছোটো যে দিনরাত অঙ্ক দিয়ে তার ক্ষুদ্রত্বের সংখ্যা বসানোর কাজ বংশাবলীক্রমে চালালে সম্ভব হোতে পারে। আজ জানা গেছে বহু কোটি যে নক্ষত্রের সমবায়ে এই জগৎ, তাদেরই জাত-ভাই সূর্য, খুব যে বড়ো তার মর্যাদা তাও নয়।)

আমাদের এই নক্ষত্রটির চেয়ে বহুগুণ বড়ো জ্যোতিষ্কদের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে নীহারিকা। রাত্রের আকাশে খালি চোখে তাদের দেখতে পাই লেপে

দেওয়া খানিকটা আলো। দূরবীনে এবং ক্যামেরার যোগে জানা গেছে যে, যে-ভিড় নিয়ে এই নীহারিকা, তাতে নক্ষত্র জমা হয়েছে দেড়শো কোটিরও উপরে। কোনো কোনো জ্যোতিষী বলেন এর সংখ্যা হবে তিন হাজার ক্রোটি। জ্যোতিষীরা শুধু যে সংখ্যা ও আয়তন মেপেছেন তা নয় এর ওজন হিসাব করেছেন, বলেছেন এর ভার সূর্যের চেয়ে দুই হাজার সত্তরশো কোটিগুণ বেশি। এই যে নক্ষত্রের ভিড় নীহারিকামণ্ডলে অতি দ্রুতবেগে ছুটছে, এরা পরস্পর ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যায় না কেন। উত্তর দিতে গিয়ে চৈতন্য হোলো এই নক্ষত্রপুঞ্জকে ভিড় বলা ভুল হয়েছে। এদের মধ্যে গলাগলি ঘেঁষাঘেঁষি একেবারেই নেই। পরস্পরের কাছ থেকে অত্যন্তই দূরে দূরে এরা চলাফেরা করছে। পরমাণুর অন্তর্গত ইলেক্‌ট্রনদের গতিপথের দূরত্ব সম্বন্ধে স্যর জেম্‌স্ জীন্‌স্ যে উপমা দিয়েছেন এই নক্ষত্রমণ্ডলীর সম্বন্ধেও অনুরূপ উপমাই তিনি প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন, লণ্ডনে ওয়াটর্লু নামে এক মস্ত স্টেশন আছে। যতদূর মনে পড়ে সেটা হাওড়া স্টেশনের চেয়ে বড়োই। স্যর জেম্‌স্ জীন্‌স্ সাহেব বলেন সেই স্টেশন থেকে আর সমস্ত খালি করে ফেলে কেবল ছ'টি মাত্র ধুলোর কণা যদি রেখে দেওয়া যায় তবে আকাশে নক্ষত্রদের পরস্পর দূরত্ব এই ধূলিকণাদের বিচ্ছেদের সঙ্গে কিছু পরিমাণে তুলনীয় হোতে পারবে। তিনি বলেন নক্ষত্রের সংখ্যা ও আয়তন যতই হোক আকাশের অচিন্তনীয় শূন্যতার সঙ্গে তার তুলনাই হোতে পারে না।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, সৃষ্টিতে রূপবৈচিত্র্যের পালা আরম্ভ হবার অনেক আগে কেবল ছিল একটা পরিব্যাপ্ত জ্বলন্ত বাষ্প। গরম জিনিস মাত্রেরই ধর্ম এই যে ক্রমে ক্রমে সে তাপ ছাড়তে থাকে। ফুটন্ত জল প্রথমে বাষ্প হয়ে বেরিয়ে আসে। ঠাণ্ডা হোতে হোতে সেই বাষ্পের ভিতর কণা কণা জল জমে। অত্যন্ত তাপ দিলে কঠিন পদার্থও ক্রমে যায় গ্যাস হয়ে; সেই রকম তাপের অবস্থায় বিশ্বের হালকা ভারি সব জিনিসই ছিল গ্যাস। কোটি কোটি বছর ধরে কালে কালে তা ঠাণ্ডা হচ্ছে। তাপ কমতে কমতে গ্যাস থেকে ছোটো ছোটো টুক্‌রো ঘন হয়ে ভেঙে পড়ছে। এই বিপুলসংখ্যক কণা একজোট হয়ে নীহারিকা গড়ে তুলছে। য়ুরোপীয় ভাষায় এদের বলে নেব্যুলা, বহুবচনে নেব্যুলে। এদের অনেক ধরা পড়েছে আকাশ-দেখা দূরবীনে, আরো অনেকে ক্যামেরার ছবির পটে।

গরম জিনিস যত ঠাণ্ডা হোতে থাকে তার ভিতরকার অণু হোতে থাকে ঘন, বাইরের দিকে দিতে থাকে ঠেলা। নীহারিকায় সেই দশা ঘটে। ঠাণ্ডা হোতেই অণুগুলোর বাহির-মুখো ঠেলায় নীহারিকা ঘুর খেতে থাকে।

রাস্তায় জল কাদা; সাইকেল তার উপর দিয়ে ছুটছে; জলের কণা, কাদার টুকরো চাকার থেকে ছিটিয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। বাহিরের দিকে ছিটিয়ে ফেলবার একটা জোর যেন ওর মধ্যে কাজ করছে। চাকা স্বয়ং কঠিন, অর্থাৎ তার অণুগুলো পরস্পরের টানে রয়েছে দৃঢ় হয়ে, তাই ঘোরার

বেগে যখন সেই অণুদের মধ্যে বাইরে ছোটবার ঝোঁক জাগে, তখন পরস্পরের জোর টানের কাছে সেই সমাজবিদ্রোহী ঝোঁক হার মানে। চাকার গায়ে লেগে থাকে যে কাদা তার আঁট বাঁধুনি নেই, সে পড়তে থাকে ছিট্‌কিয়ে। নীহারিকার ঘোরার বেগ যখন অত্যন্ত বেড়ে চল্‌ল, তখন তার উপর থেকে সব জ্বলন্ত গ্যাসের খণ্ড আলগা হয়ে ছুটে গেল। তারাই ক্রমে আপন আলো ও তাপ অনেক পরিমাণে খরচ করে নক্ষত্ররূপ ধরেছে। এই ব্যাপারটা আজো কেউ প্রত্যক্ষ দেখেনি বটে, কিন্তু নীহারিকার ভেঙে পড়ে নক্ষত্র ছিটিয়ে দেবার পূর্ববর্তী অবস্থা দূরবীনে ধরা পড়েছে। আমেরিকার পর্বতচূড়ায় বসানো হয়েছে মস্ত বড়ো এক দূরবীন, তার ভিতর খুব বড়ো এক নীহারিকা দেখা গেছে। সে আছে অ্যাণ্ড্রোমীডা নামধারী নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে। ঐ নীহারিকার আকার অনেকটা গাড়ির চাকার মতো। সেই চাকা ঘুরছে। একপাক ঘোরা শেষ করতে তার লাগে প্রায় দুকোটি বছর। সাড়ে আটলাখ বছর লাগে এর কাছ থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছতে। ক্রমে এ ঠাণ্ডা হয়ে আসবে, পরমাণুগুলো ঘন হয়ে বাইরের দিকে ঠেলা দিতে থাকবে, তাতে ঘোরার বেগ বাড়িয়ে তুলবে, তখন কেন্দ্র থেকে বাইরে ছিটকে পড়ার বেগ ওর এত বেশি হবে যে, ওর ছিঁড়ে পড়া টুকরোয় হাজার হাজার নক্ষত্রের সৃষ্টি হবে।

দূরবীনে শুধু কয়েকটিমাত্র নীহারিকার খবর পাওয়া গিয়েছিল, ক্যামেরায় বেরিয়ে পড়েছে বিস্তর। পৃথিবী থেকে

কোনটা কতদূরে তারও সন্ধান পাওয়া সহজ হয়েছে। সাধারণত আমরা দূরত্ব গনি ক্রোশ বা মাইল হিসাবে। নক্ষত্র নীহারিকার বেলায় তা করতে গেলে অঙ্কের বোঝা দুর্বহ হয়ে ওঠে। সূর্যই তো আমাদের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে, নক্ষত্র নীহারিকারা সূর্য থেকে আরও এত অত্যন্ত দূরে যে লম্বা সার-বাঁধা সংখ্যা সাজিয়ে লেখা যদি বা সম্ভব হয় সে লেখাটা হবে যেন কড়ি দিয়ে লক্ষ মোহর গনা। সংখ্যা সংকেত বানিয়ে মানুষ লেখনের বোঝা হাল্‌কা করেছে, হাজার লিখতে তাকে হাজারটা দাঁড়ি কাটতে হয় না। কিন্তু জ্যোতিষ্কলোকে এ সংকেত কুলোলো না। তাই আর এক সংকেত বেরিয়েছে। আলো সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল চলে। এক বছরে সে চলে পাঁচলক্ষ আটাশি হাজার কোটি মাইল। সূর্য প্রদক্ষিণের যেমন সৌর বছর, তেমনি এই আলো চলার বছরকে বলা যায় light year আলো-বছর। এই আলো-বছর-চলা মাইলকে এক একমাত্রারূপে ধরে নক্ষত্র নীহারিকার দূরত্বের হিসাব করা হয়ে থাকে।

নীহারিকাগুলি অনেক নক্ষত্র নিয়ে এক একটি জগৎ বিশেষ। আমাদের সৌরমণ্ডল এই রকম একটি নাক্ষত্র জগতের অর্থাৎ নীহারিকার অন্তর্ভুক্ত। এই জগৎটির আকার গোল। এর সমস্ত নক্ষত্রই এর একটি কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে, চাকা যেমন ঘোরে আপন নাভির চারদিকে। এই ঘূর্ণিপাকের টানে সূর্য সপরিজনে যাত্রা করেছে আকাশ পথে এক সেকেণ্ডে দুশো মাইল বেগে। এই নক্ষত্রচক্রের

আয়তন এত বড়ো যে একবার ঘোরা শেষ করতে এর লাগে প্রায় ২৫ কোটি বছর। চলতি চাকার থেকে ছিটকে পড়া কাদার মতোই ঘোরার বেগে নক্ষত্রচক্র থেকে সূর্য ছিটকে পড়ত,—সব নক্ষত্রে মিলে ওকে টেনে রেখেছে। সূর্য যে পথে চলছে সে পথের সীমা বাঁচিয়ে ওকে চালাতে কত নক্ষত্রের শাসন দরকার গণক পণ্ডিতেরা তার হিসাব কষে দেখতে চেষ্টা করেছেন। ঠিক করেছেন এই চক্রে নক্ষত্র আছে হাজার কোটিরও বেশি। আবার অন্য কোনো যুক্তিতে কেউ কেউ বলেন তিন হাজার কোটি।

নীহারিকা দলের এক জাতের স্বভাব এই যে, তাদের প্রত্যেকের মাঝখানে একটি করে নক্ষত্র আর সেই নক্ষত্রকে ঘিরে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ানো গ্যাসের ওড়না। এই রকমের একটা নীহারিকার গ্যাসীয় উত্তরীয়ের প্রশস্ততা কতটা, ভেবে দেখা যাক। একটা হাউই যদি মেলে যেটা ছোটে ঘণ্টায় পাঁচ হাজার মাইল বেগে তাহোলে ঐ গ্যাসের ঘের পেরিয়ে নক্ষত্রে পৌঁছতে তার লাগবে ৯০ হাজার বছর। অথচ মাঝখানের তারাটির ব্যাস আমাদের সূর্যের পাঁচভাগের একভাগ মাত্র। কিন্তু উত্তাপের মাত্রা সত্তর পঁচাত্তর হাজার সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি। মনে রাখতে হবে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে গরম জল ফুটে ওঠে। পঁচাত্তর হাজার সেন্টিগ্রেড ডিগ্রির তাপকেই জগতে আমরা সব চেয়ে গরম বলে জানি। কিন্তু এ তাপটা নক্ষত্রের উপরের তলার তাপ, তার ভিতরের জ্বলনকুণ্ডের তাপ এর চেয়েও বেশি হবার কথা।

সব চেয়ে দূরের যে নীহারিকার ছবি তোলা গেছে তার থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে পঞ্চাশ কোটি বছর। এই দূরত্ব জানার পরে, যে-নাক্ষত্র-বিশ্বকে বলতে পারি আমাদের আপন, তার আয়তনের একটা হিসাব পাওয়া গেছে। সেই হিসাবে দেখা গেল এই বিশ্বসীমানায় একধার থেকে আর একধার পর্য্যন্ত চলতে আলোর লাগে তিন চার হাজার কোটি বছর। এটা হোলো বর্তমান আয়তন। অনেকের মতে এই আয়তন বেড়েই চলেছে, দেড়শো কোটি বছর পরে হবে এখনকার দ্বিগুণ। কিন্তু বিশ্বের এখনকার যে আয়তন ধরে নেওয়া হচ্ছে সেটাকে ঠিক বর্তমান বলা চলে না। তার খবর এনেছে যে আলো, পথ চলতে তার লেগেছে পঞ্চাশ ষাট কোটি বছর।

সৌরজগৎ যে ছায়াপথের অন্তর্গত, দূরবীন আবিষ্কারের পর, তার বাইরে অ্যাণ্ড্রোমীডা নক্ষত্ররাশির মধ্যে বৃহৎ একটা নীহারিকা দেখা গিয়েছিল। এর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। একে প্রথমে দেখা গিয়েছিল জ্যোতির্ময় মেঘের মতো। তার পরে বোঝা গেল সে একটি বিরাট নক্ষত্রগুচ্ছ। আমাদের নীহারিকার সঙ্গে তার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য। উভয়েই চক্রাকার, চ্যাপটা, মাঝখানটা নিবিড়তর, ধারের দিকটা পাতলা। তা ছাড়া এই নীহারিকার ছবি দেখলেই বোঝা যায়, আমাদেরই নীহারিকার মতো এ ঘুরছে। আরো অনেক দেখা গেছে এই ধরণের নীহারিকা। তারা গোলাকৃতি অসমাপ্ত, যেন কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। এই সব নীহারিকার বৃহত্ত্বের ধারণা

করা যায় না, সংখ্যা দিয়ে বর্ণনা করা যায় মাত্র। স্যর জেম্‌স্‌ জীন্‌স্‌ বলেন, নীহারিকাগুলোতে যা পদার্থ আছে তার থেকে খুব সম্ভব দুশো কোটি নক্ষত্র গড়া যেতে পারে। অ্যাণ্ড্রোমীডার বিরাট নীহারিকার কেন্দ্রস্থলে দেখা যায় যেন একটা জ্বলন্ত মেঘপুঞ্জ, বোধ হয় একটা পরিস্ফীত গ্যাস্‌রাশি, সেটা ক্রমে ক্রমে ভেঙে ভেঙে নক্ষত্র সৃষ্টি করতে থাকবে।

এই সৃষ্টির কাজ চলছে। কোনো কোনো নীহারিকা এই সৃষ্টির শেষ পরিণতির দিকে অনেকটা এগিয়েছে। তারা প্রায় সবটাই তারার গুচ্ছ হয়ে উঠেছে। মেঘের ভাব কেটে গেছে, ঘূর্ণাবর্তের একটুখানি চেহারা রয়ে গেছে মাত্র।

আমাদের নাক্ষত্র বিশ্বের সীমানার মধ্যে এত বড়ো নক্ষত্রেরও খবর পাওয়া যায় যা সূর্যের চেয়েও দশ কোটি গুণ বড়ো, আবার এমন নক্ষত্রও আছে যা সূর্যের চেয়ে দশ লক্ষ গুণ ছোটো, অর্থাৎ পৃথিবীর চেয়ে কিছু বড়ো। কোনো কোনো নক্ষত্র আছে যাদের উজ্জ্বলতা দশহাজার সূর্যের সমান আবার এমনও আছে যাদের আলো সূর্যের আলোর দশ হাজার ভাগেরও কম।

আলো জিনিসটাতে কেবল যে নক্ষত্রের অস্তিত্বের খবর দেয় তা নয়, ওদের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ আছে মানুষ সে খবরও আলোর যেন বুক চিরে আদায় করে নিয়েছে। কেমন করে আদায় হোলো বুঝিয়ে বলা যাক।

আগেই বলেছি তিন পিঠওয়ালা কাঁচের ভিতর দিয়ে সূর্যের সাদা আলো পার করলে তার সাতটা রঙের পরিচয়

পরে পরে বেরিয়ে পড়ে। লোহা প্রভৃতি শক্ত জিনিস যথেষ্ট তেতে জ্বলে উঠলে তার আলো ক্রমে সাদা হয়ে ওঠে। এই সাদা আলো ভাগ করলে সাত রঙের ছটা পাশাপাশি দেখা যায়। তাদের মাঝে মাঝে কোনো ফাঁক থাকে না। কিন্তু লোহাকে গরম করতে করতে যখন তা গ্যাস হয়ে যায় তখন কাঁচের ভিতর দিয়ে তার আলো ভাঙলে বর্ণচ্ছটায় একটানা আলো পাইনে। দেখা যায় আলাদা আলাদা উজ্জ্বল রেখা, তাদের মধ্যে মধ্যে থাকে আলোহীন ফাঁকা জায়গা। এই রেখাচিহ্নপাতের নাম দেওয়া যাক বর্ণলিপি।

এই লিপিতে দেখা গেছে দীপ্ত গ্যাসীয় অবস্থায় প্রত্যেক জিনিসের আলোর বর্ণচ্ছটা স্বতন্ত্র। নুনের মধ্যে সোডিয়ম নামক এক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। তাপ দিয়ে দিয়ে তাকে গ্যাস করে ফেললে বর্ণলিপিতে তার আলোর মধ্যে খুব কাছাকাছি দেখা যায় দুটি হলদে রেখা। আর কোনো রং পাইনে। সোডিয়ম ছাড়া অন্য কোনো জিনিসেরই বর্ণচ্ছটায় ঠিক ঐ জায়গাতেই ঐ দুটি রেখা মেলে না। ঐ দুটি রেখা যেখানকারই গ্যাসে দেখা যাবে বুঝব সেখানে সোডিয়ম আছেই।

কিন্তু হয়তো এক সময়ে দেখা গেল বর্ণচ্ছটায় সোডিয়ম গ্যাসের ঐ দুটি উজ্জ্বল হলদে রেখা চুরি গেছে, তার জায়গায় রয়েছে দুটো কালো দাগ। বিজ্ঞানী বলেন উত্তপ্ত কোনো গ্যাসীয় জিনিসের আলো সেই গ্যাসেরই অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা স্তরের ভিতর দিয়ে আসার সময় সম্পূর্ণ শোষিত

হয়। এই আলোর অভাবেই যে কালো দাগের সৃষ্টি তা নয়। বস্তুত যে গ্যাস্ এই আলো আটক করে সেও আপন উত্তাপ অনুযায়ী আলো ছড়িয়ে দেয়, উত্তাপ কম ব'লে এর আলো হয় অনেকটা ম্লান। এই ম্লান আলো বর্ণচ্ছটার উজ্জ্বল আলোর পাশে কালোর বিভ্রম জন্মায়।

মৌলিক জিনিস মাত্রেরই আলো ভেঙে প্রত্যেকটির বর্ণচ্ছটার ফর্দ তৈরি হয়ে গেছে। এই বর্ণভেদের সঙ্গে তুলনা করলেই বস্তুভেদ ধরা পড়বে, তা সে যেখানেই থাক্, কেবল গ্যাসীয় অবস্থায় থাকা চাই।

পৃথিবী থেকে যে ৯২টি মৌলিক পদার্থের খবর পাওয়া গেছে সূর্যে তার সবগুলিই থাকা উচিত; কেননা পৃথিবী সূর্যেরই দেহজাত। প্রথম পরীক্ষায় পাওয়া গিয়েছিল ৩৬টি মাত্র জিনিস। বাকিগুলোর কী হোলো সেই প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন বাঙালি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। নূতন সন্ধানপথ বের করে সূর্যে আরো কতকগুলি মৌলিক জিনিস তিনি ধরতে পেরেছেন। তাঁর পথ বেয়ে প্রায় সবগুলিরই খবর মিলেছে। আজো যেগুলি গরঠিকানা, মাঝপথেই পৃথিবীর হাওয়া তাদের সংবাদ শুষে নেয়।

প্রকাণ্ড আয়তন ও প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে নক্ষত্রদের শুরু। তারা গোড়ায় থাকে সাদা, তার পরে হয়ে আসে হলদে, সবশেষে হয় লাল। লাল নক্ষত্র আরো ঠাণ্ডা হোলে খরচ করবার মতো আলোর পুঁজি আর তার থাকেই না। এই সব দেউলে নক্ষত্র বাস করে অন্ধকারে অখ্যাত হয়ে।

বেটেলজিয়ুস নামে এক মহাকায় নক্ষত্র আছে তার লাল আলো দেখেই বোঝা যায় তার বয়স হয়েছে যথেষ্ট। প্রশ্ন ওঠে তবে তার এত উজ্জ্বলতা কেন। জানা গেছে পৃথিবীতে তার আলো পৌঁছয় প্রায় ১৯০ বছরে। অতএব ওর আলোটাকে কাছের আলো বলে দাবি করা চলে না। আসল কথা আয়তন এর অতি প্রকাণ্ড, ২০ কোটি মাইল এর ব্যাস। বহুকোটি সূর্যকে এর মধ্যে জায়গা দিতে পারা যায়। বৃশ্চিক রাশিতে অ্যাণ্টারস নামে একটি নক্ষত্র আছে তার ব্যাস বেটেলজিউসের প্রায় দুনো। আয়তন মস্ত কিন্তু ওজন সূর্যের চেয়ে কেবল ত্রিশগুণমাত্র বেশি। এর উপাদান যে কত হাল্‌কা সে ভেবে পাওয়া যায় না, জলের ভার তার চেয়ে ত্রিশলক্ষগুণ বেশি।

আবার এমন নক্ষত্রও আছে যারা গ্যাসময় বটে কিন্তু ওজনে লোহার চেয়ে ভারি। কেন্দ্রের কাছে সূর্যের তাপ প্রায় দুই কোটি ডিগ্রি। সূর্যের চেয়েও যাদের উত্তাপ আরো অনেক বেশি তাদের মধ্যে অণুপরমাণু কিছুই আস্ত থাকে না। এদিকে নক্ষত্র আপন দেহভারের চাপ লাগায় তাদের উপর প্রচণ্ড জোরে, গ্যাসপিণ্ডের পরমাণু ঠাসা হয়ে যায়, তাই গ্যাসীয় অবস্থা সত্ত্বেও এসব নক্ষত্রের ভার হয়েছে বেশি, তার সমস্ত দ্রব্য জলের চেয়ে হয়েছে ষাট হাজার গুণ ভারি। আয়তনে এর চেয়ে খাটো হয়ে ওজনে একেও ছাড়িয়ে গেছে এমন নক্ষত্রেরও খবর মিলেছে। পৃথিবীর চেয়েও আয়তনে কম কিন্তু তার পদার্থপুঞ্জ জলের চেয়ে চার লক্ষগুণ ঘন।

এই প্রসঙ্গে বুঝে নেওয়া যাক কেন কোনো জিনিস ভারি হয়।

সত্য হোক মিথ্যে হোক একটা গল্প চলিত আছে যে, বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ন্যূটন একদিন দেখতে পেলেন একটা আপেল ফল গাছ থেকে পড়ল তখনি তাঁর মনে প্রশ্ন উঠল ফলটা নিচেই বা পড়ে কেন উপরেই বা যায় না কেন উড়ে। ভেবে দেখলেন পৃথিবী সব কিছুকেই নিজের দিকে টানছে, তার একটা টান দেবার শক্তি আছে। এই শক্তির নাম দেওয়া হোলো power of gravitation, বাংলায় বলা যেতে পারে মহাকর্ষ। যার মধ্যে বস্তু পরিমাণ যতটা আছে তার উপরে পৃথিবীর টান পড়ে তত বেশি। শুধু পৃথিবী কেন এমন কোনো জিনিসই নেই যা টান দেয় না। টান দেবার শক্তি কারো বেশি কারো কম। দূরত্বের কমি বেশিতে এই টানের কমি বেশি। বস্তু পরিমাণ দ্বিগুণ হোলে তার উপরে টান লাগে দ্বিগুণ,কিন্তু দূরত্ব দ্বিগুণ বাড়লে টান কমে যায় চারগুণ। চারগুণ হোলে কমে ষোলো গুণ। এ যদি না হোত তাহোলে সূর্যের টান এড়াবার জো থাকত না, এই টানাটানির পালোয়ানিতে পৃথিবী কাছে আছে বলেই জিতে গেছে।

এই টানের জোর বিশ্বের সকল জিনিসেই আছে নইলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এমনতরো সমগ্র হয়ে থাকতে পারত না। কিন্তু ঐ টানের ধর্মই যদি একান্ত হোত তাহোলে সেই টানের জোরে সমস্ত বিশ্ববস্তু আয়তন হারিয়ে নিরেট হয়ে একটিমাত্র বিন্দুতে অচল হয়ে থাকত।

আমাদের ভাষায় জগৎ শব্দটার মূল অর্থই হচ্ছে যা চলছে। বিজ্ঞানে একথার প্রমাণ হয়ে গেছে যে, প্রত্যক্ষে যাদের দেখছি স্থির, অপ্রত্যক্ষে তাদের পরমাণুরা নিত্য চঞ্চল। পূর্বেই বলেছি এই চলার ব্যাপার দুটি বৈদ্যুত শক্তির যোগে। বিজ্ঞানীরা তাদের নাম দিয়েছেন, পজিটিভ ও নেগেটিভ, হাঁ-ধর্মী বৈদ্যুত এবং না-ধর্মী বৈদ্যুত। অর্থাৎ তারা পরস্পরের বিপরীত। এই বিপরীত পরমাণুর যুগল মিলনে যে সৃষ্টি হোলো সেই জগৎটাও দেশে কালে কেবলি চলছে। এর মধ্যেও সর্বব্যাপী দুই বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া, চলা আর টানা, মুক্তি আর বন্ধন। এক দিকে ব্রহ্মাণ্ডজোড়া মহাদৌড় আর একদিকে ব্রহ্মাণ্ডজোড়া মহাটান। সবই চলছে আর সবই টানছে। চলাটা কী, আর কোথা থেকে তাও জানিনে, আর টানাটা কী আর কোথা থেকে তাও জানিনে। আজকের বিজ্ঞানে বস্তুর বস্তুত্ব এসেছে অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে, সব চেয়ে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে চলা আর টানা। চলা যদি একা থাকত তাহোলে চলন হোত একেবারে সিধে রাস্তায় অন্তহীনে। টানা তাকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনছে অন্তবানে, ঘোরাচ্ছে চক্রপথে। সূর্য এবং গ্রহের মধ্যে আছে বহুলক্ষ মাইল ফাঁকা, সেই দূরত্বের শূন্য পার হয়ে নিরন্তর চলেছে অশরীরী টানের শক্তি, অদৃশ্য লাগামে বেঁধে গ্রহগুলোকে ঘোরাচ্ছে সার্কসের ঘোড়ার মতো। এদিকে সূর্যও ঘুরছে বহুকোটি ঘূর্ণ্যমান নক্ষত্রে তৈরি এক মহা জ্যোতিশ্চক্রের টানে। বিশ্বের অণীয়সী গতিশক্তির দিকে তাকাও সেখানেও

এই বিরাট চলাটানার একই ছন্দের লীলা। সূর্য আর গ্রহের মাঝখানের যে দূরত্ব, তুলনা করলে দেখা যাবে অতি-পরমাণু জগতে প্রোটন ইলেক্‌ট্রনের মধ্যেকার দূরত্ব কম বেশি সেই পরিমাণে। টানের জোর সেই শূন্যকে পেরিয়ে নিত্য কাল বাঁধা পথে ঘোরাচ্ছে ইলেক্‌ট্রনের দলকে। গতি আর সংযমের অসীম সামঞ্জস্য নিয়ে সব কিছু। এইখানে আর একবার বলে রাখা দরকার, ইলেক্‌ট্রন প্রোটনের টানাটানি মহাকর্ষের নয়, সেটা বৈদ্যুত টানের। পরমাণুদের অন্তরের টানটা বৈদ্যুতের টান, বাহিরের টানটা মহাকর্ষের।

মহাটানের জালে ধরা পড়া এই ঘূর্ণিপাকের জগতে কোথাও কোথাও বাঁধা পড়েছে জুড়ি নক্ষত্র। দোঁহে মিলে চলছে প্রদক্ষিণ। জুড়ির মধ্যে একটির যদি থাকে কম-শক্তি তাকে দিয়েই প্রদক্ষিণের অনুষ্ঠানটা সেরে নেওয়া সহজ। সূর্য পৃথিবীর সম্বন্ধটা দেখলেই সেটা বোঝা যায়। অবশ্য পৃথিবী যে কিছু টানে না তা নয়। কিন্তু সূর্যকে বড় বেশি বিচলিত করতে পারে না। পৃথিবীকেই করতে হয় প্রদক্ষিণ। যেখানে দুই জ্যোতিষ্ক প্রায় সমান জোরের সেখানে উভয়ের মাঝামাঝি জায়গায় একটা লক্ষ্য স্থির থাকে, দুই নক্ষত্র সেইটিই প্রদক্ষিণ করে, কেউ কারো কাছে হার মানে না।

কোনো কোনো জুড়ির ঘোরার সময় লাগে বহু সহস্র বছর। কখনো দেখা যায় প্রদক্ষিণের সময় মাঝে মাঝে একটি নক্ষত্র আরেকটিকে আড়াল করে ফেলে, এতে করে ঐ নক্ষত্রের উজ্জ্বলতায় কমি বেশি ঘটে। কিন্তু উজ্জ্বলতায়

বিশেষ লোকসান ঘটাতে পারত না যদি আড়ালকারী নক্ষত্র অনুজ্জ্বল না হোত। আকাশে বুড়ো নক্ষত্র নিঃসন্দেহ অনেক আছে, তাদের জ্বলুনি কমে এসেছে তবু তাদের ছুটি মেলেনি, দশের টানে তাদেরও ঘুরতেই হচ্ছে। এরা মরেনি কিন্তু মহিমা হারিয়েছে। এই রকম বুড়ো নক্ষত্রের সঙ্গে যদি কোনো তেজালো নক্ষত্রের যোগ ঘটে তাহোলে পরস্পরের টানে উভয়ের চালচলন হবে নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু মুখোমুখি হোলেই দূরের দর্শকের চোখে একটিতে অন্যটির দীপ্তি দেবে ঢেকে।

নক্ষত্রেরা এতই দূরবর্তী যে আমাদের দৃষ্টিতে তাদের চলাও যা না চলাও তা। এইজন্যে তাদের এগোনো পিছোনোর হিসাব করা অসম্ভব ছিল। বর্ণলিপির সাহায্যে এখন তা সম্ভব হয়েছে। দূর আকাশের কোনো জ্যোতির্ময় পদার্থ দর্শকের দিকে যখন এগিয়ে আসতে থাকে তখন তাতে তার একটু বিশেষত্ব ঘটে। ঐ পদার্থটি স্থির থাকলে যতগুলি আলোর ঢেউ আমাদের দিকে পৌঁছিয়ে দিত কাছের দিকে আসতে থাকলে তার চেয়ে বেশি দিতে থাকে। দূরের দিকে গেলে তার উল্‌টো হবে। পূর্বেই বলেছি আলোর ঢেউ যখন সংখ্যায় হয় বেশি সুতরাং দৈর্ঘ্যে হয় কম তখন তার রঙ যায় বর্ণসপ্তকের বেগনির দিকে। আর যখন সংখ্যায় হয় কম দৈর্ঘ্যে হয় বেশি তখন চোখে সেটাকে লাল রং ব'লে ঠেকে। নক্ষত্র আমাদের অভিমুখে আসছে কি আমাদের থেকে দূরে যাচ্ছে সে তার বেগনি কিম্বা লাল সংকেতে ধরা পড়বে।

নক্ষত্রজগতের দেশকালের পরিমাপ, পরিমাণ, গতিবেগ,

দূরত্ব ও তার অগ্নি আবর্তের অবর্ণনীয় প্রচণ্ডতা দেখে যতই বিস্ময় বোধ করি একথা মানতে হবে সকলের চেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় এই যে মানুষ তাদের জানছে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ, বিশ্ব-ইতিহাসের নিরতিশয় ক্ষুদ্র সময়ে সে বর্তমান, অতি বৃহৎ বিশ্বসংস্থিতির অতি ক্ষুদ্র স্থানটুকুতে সে অবস্থিত, অথচ অসীমের কাছ-ঘেঁষা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুষ্পরিমেয় বৃহৎ ও দুরধিগম্য সূক্ষ্মের হিসাব সে রাখছে এর চেয়ে আশ্চর্যের কথা বিশ্বচরাচরে আর কিছুই নেই। বিশ্বসৃষ্টিতে মানুষেই প্রথম প্রকাশ পেয়েছে যে ভূমা বাহিরের আয়তনে নয় পরিমাণে নয়, আন্তরিক পরিপূর্ণতায়।

সৌরজগৎ

নক্ষত্রেরা পরস্পর বহু কোটি মাইল দূরে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব'লে গায়ে গায়ে তাদের ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। কেউ কেউ আন্দাজ করেন যে প্রায় দুশো কোটি বছর আগে এই রকমের একটি দুঃসম্ভব ঘটনাই হয়তো ঘটেছিল। একটি প্রকাণ্ড নক্ষত্র এসে পড়েছিল তখনকার যুগের সূর্যের কাছে। ঐ নক্ষত্রের টানে সূর্যের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে উথলে উঠল অগ্নিবাষ্পের জোয়ারের ঢেউ। অবশেষে টানের চোটে কোনো কোনো ঢেউ বেড়ে উঠতে উঠতে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। সেই বড়ো নক্ষত্র হয়তো এদের কতকগুলোকে আত্মসাৎ করে থাকবে, বাকি টুকরোগুলো সূর্যের প্রবল টানে তখন থেকে ঘুরতে লাগল সূর্যের চারিদিকে। সেই ছোটো বড়ো জ্বলন্ত বাষ্পের টুকরোগুলি থেকেই গ্রহদের উৎপত্তি; পৃথিবী তাদেরই মধ্যে একটি। এরা ক্রমশ আপন তেজ ছড়িয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গ্রহের আকার ধরেছে। আকাশে নক্ষত্রের দূরত্ব, সংখ্যা ও গতি হিসাব ক'রে দেখা গেছে যে প্রায় ৫।৬ হাজার কোটি বছরে একবার মাত্র এরকম অপঘাত ঘটতেও পারে। গ্রহসৃষ্টির এই মত মেনে নিলে বলতে হবে যে গ্রহপরিচরওয়ালা নক্ষত্রসৃষ্টি এই বিশ্বে প্রায় অঘটনীয় ব্যাপার। যাঁরা এই

মত মেনে নেননি তাঁদের অনেকে বলেন যে প্রত্যেক নক্ষত্রের বিকাশের বিশেষ অবস্থায় ক্রমশ এমন একটা সময় আসে যখন সে পাকা শিমুল ফলের মতো ফেটে গিয়ে প্রচণ্ডবেগে চারিদিকে পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নিবাষ্প ছড়িয়ে ফেলে দেয়। কোনো কোনো নক্ষত্র থেকে হঠাৎ এ রকম জ্বলন্ত গ্যাস বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে। ছোটো একটি নক্ষত্র ছিল, কয়েক বছর আগে তাকে ভালো দূরবীন ছাড়া কখনও দেখা যায়নি। এক সময় হঠাৎ দীপ্তিতে সে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের প্রায় সমতুল্য হয়ে উঠল। আবার কয়েকমাস পরে আস্তে আস্তে তার প্রবল প্রতাপ এত ক্ষীণ হয়ে গেল যে পূর্বের মতোই তাকে দূরবীন ছাড়া দেখাই গেল না। উজ্জ্বল অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে এই নক্ষত্রটি পুঞ্জপুঞ্জ যে জ্বলন্ত বাষ্প চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে সেইগুলিই আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে গ্রহউপগ্রহের সৃষ্টি ঘটাতে পারে ব'লে অনুমান করা অসংগত নয়। এই মত স্বীকার করলে বলতে হবে যে কোটি কোটি নক্ষত্র এই অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়েছে, অতএব সৌরজগতের মতোই আপন আপন গ্রহদল নিয়ে কোটি কোটি নাক্ষত্র-জগৎ এই বিশ্ব পূর্ণ করে আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আছে যে নক্ষত্র তারও যদি গ্রহ-মণ্ডলী থাকে তবে তা দেখতে হোলে যত বড়ো দূরবীনের দরকার তা আজও তৈরি হয় নি।

অল্প কিছুদিন হোলো কেম্ব্রিজের এক তরুণ পণ্ডিত (Lyttleton) সৌরজগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি নূতন মত

প্রচার করেছেন। পূর্বেই বলেছি আকাশে অনেক জোড়া-নক্ষত্র পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে। এঁর মতে আমাদের সূর্যেরও একটি জুড়ি ছিল। ঘুরতে ঘুরতে আর একটা ভবঘুরে জ্যোতিষ্ক এসে এই অনুচরের গায়ে পড়ে ধাক্কা মেরে তাকে অনেকদূরে ছিট্‌কে ফেলে দিয়ে চলে গেল। চলে যেতে যেতে পরস্পর আকর্ষণের জোরে মস্ত বড়ো একটা জ্বলন্ত বাষ্পের টানা সূত্র বের হয়ে এসেছিল; তারই ভিতর মিশিয়ে ছিল এদের উভয়ের উপাদান সামগ্রী। এই বাষ্পসূত্রের যে অংশ সূর্যের প্রবল টানে আটকা পড়ে গেল সেই বন্দীকরা গ্যাসের থেকেই জন্মেছে আমাদের গ্রহমণ্ডলী। এরা আয়তনে ছোটো ব'লেই ঠাণ্ডা হয়ে আসতে দেরি করলে না; তাপ কমতে কমতে গ্যাসের টুকরোগুলো প্রথমে হোলো তরল, তারপর আরও ঠাণ্ডা হোতেই তাদের বাইরের দিকটা জমে গিয়ে হোলো শক্ত। কিন্তু ভিতরটা এখনও ভরতি হয়ে আছে উষ্ণ তরল ও গ্যাসীয় জিনিসে। কেন সূর্য এতদিনে জুড়িয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে যায়নি, বিজ্ঞানীরা তার যে একটা কারণ আন্দাজ করেছেন, বুঝিয়ে বলা যাক।

উত্তাপে বরফ গ'লে জল হয়। অর্থাৎ বরফে যে পরমাণু-গুলো শক্ত হয়ে এঁটে ছিল তাপের ধাক্কায় তারা যায় আলগা হয়ে, নড়ে চড়ে বেড়ায় সহজে। আরো তাপ লাগালে জল যায় বাষ্প হয়ে, তখন টানের জোর আরো যায় কমে, পরমাণুগুলো দলছাড়া হয়ে ঘুরতে ফিরতে থাকে। এই

বাষ্পকে যদি আরো অত্যন্ত গরম করা যায় তাহোলে চাঞ্চল্যের প্রবলতায় জলের বাষ্প থেকে বাঁধন ছিঁড়ে অক্সিজেন হাইড্রোজেন অর্থাৎ জলের মূল পরমাণুগুলি ছাড়া পায়। সূর্যের মধ্যে যে তাপ আছে সেই তাপ যদি এদেরও উপরে লাগানো যায়, তাহোলে দেখা যাবে সেই বাষ্পের পরমাণুগুলো ভাঙতে শুরু করেছে। সূর্যের উপরিতলে সেই পরমাণু ভাঙনের কাজ চলছে। এই উপরিতল পার হয়ে যদি ভিতরে পরীক্ষা করা সম্ভব হোত, তাহোলে দেখা যেত পরমাণুগুলো সম্পূর্ণ গেছে ভেঙে। পদার্থের সে অবস্থার কোনো অভিজ্ঞতাই আমাদের নেই। বিজ্ঞানীরা বলেন পরমাণু ভাঙনের প্রক্রিয়া থেকে যে তেজ বেরোয় সে অতি প্রচণ্ড। যে উত্তপ্ত জ্যোতিষ্কের মধ্যে পরমাণুর এই রকম রূপ বদলের উত্তেজনা কেবলি চলেছে সেখানে তার আর ঠাণ্ডা হবার সময় থাকে না। তাই কোটি কোটি বছর ধরে এই প্রলয়ের ক্ষোভে সূর্যের তাপ কমতে দিচ্ছে না। এই মতটা মেনে নিলে বোঝা যাবে সূর্যের সম্বল ক্ষয় হয়েও অন্যদিকে পূরণ হবার ব্যবস্থা আছে।

সূর্যের দূরত্বের কথাটা অঙ্ক দিয়ে বলবার চেষ্টা না করে একটা কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলা যাক। আমাদের দেহে যে সব অনুভূতি ঘটছে আমাদের কাছে তার খবর চালাচালির ব্যবস্থা করছে অসংখ্য স্পর্শনাড়ী। এই নাড়ীগুলি আমাদের শরীর ব্যাপ্ত করে মিলেছে মস্তিষ্কে গিয়ে। টেলিগ্রাফের তারের মতো তাদের যোগে মস্তিষ্কে খবর আসে,

আমরা জানতে পারি কোথায় পিঁপড়ে কামড়াল, জিবে যে খাদ্য লাগল সেটা মিষ্টি, যে দুধের বাটি হাতে তুললুম সে গরম। আমাদের শরীরটা হাওড়া থেকে বর্ধমানের মতো প্রশস্ত নয়, তাই খবর পেতে দেরি লাগে না। তবু অতি অল্প একটু সময় লাগেই ; সে এতই অল্প যে তা মাপা শক্ত। কিন্তু পণ্ডিতেরা তাও মেপেছেন। তাঁরা পরীক্ষা করে স্থির করেছেন যে মানুষের শরীরের মধ্য দিয়ে দৈহিক ঘটনা অনুভূতিতে পেঁছয় সেকেণ্ডে চারশো ফুট বেগে। মনে করা যাক, এমন একটা দৈত্য আছে, পৃথিবী থেকে হাত বাড়ালে যার হাত সূর্যে পেঁছতে পারে। দুঃসাহসী দৈত্যের হাত যতই শক্ত হোক, সূর্যের গা ছোঁবা মাত্রই যাবে পুড়ে। কিন্তু পুড়ে যাওয়ার যে ক্ষতি ও যন্ত্রণা নাড়ীযোগে সেটা টের পেতে লাগবে প্রায় চল্লিশ বছর। তার আগেই সে মারা যায় তো জানবেই না।

সূর্যের ব্যাস ৮ লক্ষ ৬৬ হাজার মাইল ; ১১০টি পৃথিবী পাশাপাশি এক সরল রেখায় রাখলে সূর্যের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পেঁছতে পারে। সূর্যের ওজন পৃথিবীর চেয়ে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার গুণ বেশি, তাই নিজের দিকে সে টান দিতে পারে সেই পরিমাণ ওজনের জোরে। এই টানের জোরে সূর্য পৃথিবীকে আয়ত্তে বেঁধে রাখতে পারে, কিন্তু যথেষ্ট দূরে থাকাতে তাকে আত্মসাৎ করতে পারে না।

একটা আলুর ঠিক মাঝখান দিয়ে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত যদি একটা শলা চালিয়ে দেওয়া যায় আর সেই

শলাটার চারদিকে যদি আলুটাকে ঘোরানো যায়, তাহোলে সেই ঘোরা যেমন হয় সেইরকম হয় ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর এক-বার করে ঘুর খাওয়া। আমরা বলি পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের চারদিক ঘুরছে। আমাদের শলাফোঁড়া আলুটার সঙ্গে পৃথিবীর তফাৎ এই যে তার এ রকম কোনো শলা নেই। মেরুদণ্ড কোনো দণ্ডই নয়। যে জায়গাটাতে শলা থাকতে পারত কাল্পনিক সোজা লাইনের সেই জায়গাটাকেই বলি মেরুদণ্ড। যেমন লাঠিম। সে ঘোরে, আপন মাঝখানের এমন একটা খাড়া লাইনের চারদিকে, যে লাইনটা মনে করে নেওয়া।

মেরুদণ্ডের চারদিকে পৃথিবীর এক পাক ঘুরতে লাগে চব্বিশ ঘণ্টা। সূর্যও আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘোরে। ঘুরতে কতক্ষণ লাগে তা যে উপায়ে জানা গেছে সে কথা বলি। খুব ভোরে যখন আলোতে চোখ ধাঁধাঁয় না তখন সূর্যের দিকে তাকালে হয়তো দেখা যাবে সূর্যের গায়ে কালো কালো দাগ আছে। এক একটি কালো দাগ সময়ে সময়ে এত বড়ো হয়ে প্রকাশ পায় যে, সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ একত্র করলেও তার সমান হয় না। ছোটো দাগগুলি মিলিয়ে যেতে বেশি দিন লাগে না, কিন্তু বড়ো বড়ো দাগ দু-তিন সপ্তাহ থাকে। দূরবীন দিয়ে দেখলে মনে হয় যেন এরা ক্রমাগত ডানদিকে ঘুরে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে ঘুরছে এদের সবাইকে গায়ে নিয়ে সূর্য। সেই কালো দাগের অনুসরণ করে এই ঘুরে যাওয়ার সময়টার হিসাব পাওয়া গেছে; প্রমাণ হয়েছে যে পৃথিবী ঘোরে চব্বিশ ঘণ্টায়, সূর্য ঘোরে ছাব্বিশ দিনে।

এই সব কালো দাগ ব্যাপারটা কী বুঝে দেখা যাক। সূর্যের প্রচণ্ড তেজে তার উপরতলার জিনিসে সব সময়ই তোলপাড় চলছে। ভিতরে আছে প্রচুর বাষ্পীয় পদার্থ। তারা চাপা রয়েছে উপরতলার বিষম ভারে। এই চাপলাগা বাষ্পরাশি বাইরে বেরিয়ে আসার দিকে কেবলি ঠেলে উঠছে। জল গরমের সময় তার বুদ্‌বুদগুলো যতক্ষণ ভিতরে থাকে চাপে থাকে আস্তো। বেরিয়ে এলেই জলের চাপ চলে যায়। ওরা ফেটে বাতাসে যায় মিলিয়ে। তেমনি সূর্যের ভিতরকার গরম জিনিস বেরিয়ে এলে তার উপর থেকে চাপ কমে যায়, তখন সেটা ছড়িয়ে পড়ে আর ঠাণ্ডা হোতে থাকে। তাপ কমলেই দীপ্তিও কমে, চারদিকের উদ্দীপ্ত অংশের সংস্রবে তাদের কালো দেখতে হয়। এই সব পালিয়ে আসা বন্দীরাই সূর্যের গায়ে কালো দাগের লাঞ্ছনা দেয়।

এমন মতও আছে যে, সূর্যের উপরের যে তলাটা, যাকে বলা যেতে পারে জ্যোতির্মণ্ডল, যার থেকে চারদিকে আলো ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে কোথাও প্রচণ্ড ঘূর্ণি ঝড় যদি ওঠে তাহোলে সেই অংশে জ্যোতির্মণ্ডলের আবরণটা ছিঁড়ে গিয়ে গর্তের মতো বেরিয়ে পড়ে। তাদের কালো দেখায় উপরকার স্তরের উজ্জ্বলতার তুলনায়।

গ্রহলোক

গ্রহ কা'কে বলে সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সূর্য হোলো নক্ষত্র, পৃথিবী হোলো গ্রহ। সূর্য থেকে ছিঁড়ে পড়া টুকরো। ঠাণ্ডা হয়ে আলো গেছে নিবে। কোনো কোনো গ্রহের হয়তো বা এখনো তাপ থাকতে পারে কিন্তু আলো নেই। সূর্যের চারদিকে এই গ্রহদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পথ চক্ররেখার আকারে—কোনো গ্রহের পথ সূর্যের কাছে, কোনো গ্রহের পথ সূর্য থেকে বহুদূরে। সূর্যকে ঘুরে আসতে কোনো গ্রহের এক বছরের কম লাগে, কারো বা লাগে একশো বছরের বেশি। যে গ্রহেরই ঘুরতে যত সময়ই লাগুক এই ঘোরার সম্বন্ধে একটি বাঁধা নিয়ম আছে তার কখনই ব্যতিক্রম হয় না। সূর্যপরিবারে দূর বা কাছের ছোটো বা বড়ো সকল গ্রহকেই পশ্চিম দিক থেকে পূব দিকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। এর থেকে বোঝা যায় গ্রহরা সূর্য থেকে একই সময়ে একই অভিমুখে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছে, চলবার ঝোঁক হয়েছে একই দিকে। চল্‌তি গাড়ি থেকে নেবে পড়বার সময় গাড়ি যে মুখে চলছে সেই দিকে শরীরের উপর একটা ঝোঁক আসে। গাড়ি থেকে পাঁচজন নামলে পাঁচজনেরই সেই একদিকে হবে ঝোঁক। তেমনি ঘূর্ণ্যমান সূর্য থেকে বেরিয়ে পড়বার সময় সব গ্রহই একই দিকে ঝোঁক পেয়েছে। ওদের

এই চলার প্রবৃত্তি থেকে ধরা পড়ে ওরা সবাই এক জাতের, সবাই একঝোঁকা।

সূর্যের সবচেয়ে কাছে আছে বুধগ্রহ, ইংরেজিতে যাকে বলে মার্করি। সে আছে সূর্য থেকে সাড়ে তিন কোটি মাইল মাত্র দূরে। পৃথিবী যতটা দূর বাঁচিয়ে চলে তার প্রায় তিন ভাগের একভাগ। সূর্যকে একপাক ঘুরে আসতে মার্করির লাগে ৮৮ দিন, অর্থাৎ পৃথিবীর তিন মাসেরও কম। সূর্য প্রদক্ষিণের পথে পৃথিবীর দৌড়, প্রতি সেকেণ্ডে উনিশ মাইল। বুধগ্রহের দৌড় তাকে ছাড়িয়ে গেছে, তার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশ মাইল। একে ওর রাস্তা ছোটো, তাতে ওর ব্যস্ততা বেশি, তাই পৃথিবীর সিকি সময়েই ওর প্রদক্ষিণ সারা হয়ে যায়। বুধগ্রহের প্রদক্ষিণের যে পথ, সূর্য ঠিক তার কেন্দ্রে নেই, একটু এক পাশে আছে। সেইজন্যে ঘোরবার সময় বুধগ্রহ কখনো সূর্যের অপেক্ষাকৃত কাছে আসে কখনো যায় দূরে।

প্রতাপশালীর সব চেয়ে কাছে এবং সব চেয়ে দূরে থাকার প্রায় একই ফল। বুধগ্রহের পরিচয় সূর্যের প্রখর আলোয় আচ্ছন্ন; তাই ওকে অল্পই জানি। কত জোরে ও নিজের মেরুদণ্ড ঘিরে ঘুরপাক দেয় তাও ঠিকমতো বলা যায় না। ওর গায়ে এমন কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি যার দিকে লক্ষ্য রেখে ঘূর্ণিপাকের সময় হিসাব করা যেতে পারে। বুধগ্রহ আয়তনেও ছোটো। পৃথিবীর ব্যাস আট হাজার মাইল আর বুধের ব্যাস তার অর্ধেকেরও কম। এই গ্রহ সূর্যের

এত কাছে থাকাতে তাপ পাচ্ছে খুব বেশি। যত ডিগ্রি তাপে জল ফুটে ওঠে বুধগ্রহের তাপের মাত্রা তার তিন গুণেরও বেশি। এত গরমে জল বাষ্প হয়ে লোপ পায়। শুধু তাই নয়, এই তাপে বাতাসের পরমাণু এত বেশি বেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে যে বুধগ্রহ তাদের ধরে রাখতে পারে না, তারা দেশ ছেড়ে শূন্যে দেয় দৌড়। বাতাসের পরমাণু পলাতক স্বভাবের। পৃথিবীতে তারা সেকেণ্ডে দুই মাইল বেগে ছুটোছুটি করে, তাই টানের জোরে পৃথিবী তাদের সামলিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু যদি কোনো কারণে তাপ বেড়ে উঠে' ওদের দৌড় হোত সেকেণ্ডে সাত মাইল তাহোলেই পৃথিবী আপন হাওয়াকে আর সামলাতে পারত না।

যে সব বিজ্ঞানী বিশ্বজগতের হিসাবনবিশ তাঁদের একটা প্রধান কাজ হচ্ছে গ্রহ নক্ষত্রের ওজন ঠিক করা। এ কাজে সাধারণ দাঁড়ি পাল্লার ব্যবহার চলে না, তাই কৌশলে ওঁদের খবর আদায় করতে হয়। সেই কথাটা বুঝিয়ে বলি। মনে করো একটা গড়ানে গোলা হঠাৎ এসে পথিককে দিলে ধাক্কা, সে পড়ল দশ হাত দূরে। কতখানি ওজনের গোলা এসে জোর লাগালে মানুষটা এতখানি বিচলিত হয়, তার নিয়মটা যদি জানা থাকে তাহোলে এ দশ হাতের মাপটা নিয়ে গোলাটার ওজন অঙ্ক কষে বের করা যেতে পারে। একবার হঠাৎ এই রকম অঙ্ক কষার সুযোগ ঘটাতে বুধগ্রহের ওজন মাপবার সুযোগ হয়ে গেল। সুবিধাটা ঘটিয়ে দিলে একটা

ধূমকেতু। সে কথাটা বলার আগে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ধূমকেতুরা কী রকম প্রবৃত্তির জ্যোতিষ্ক। গ্রহেরা সূর্যের আত্মীয়, ধূমকেতুরা একেবারে পর। ওরা বহুদূর বাইরে থেকে হঠাৎ সূর্যের এলাকার মধ্যে এসে পড়ে, কোনো-মতে একবার সূর্যের চারদিকে ঘুরে তখনি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

ধূমকেতু শব্দের মানে ধোঁয়ার নিশান। ওর চেহারা দেখে নামটার উৎপত্তি। গোল মুণ্ড আর তার পিছনে উড়ছে উজ্জ্বল একটা লম্বা নিশান, সাধারণত এই হোলো ওর আকার। এই নিশানটা অতি সূক্ষ্ম বাষ্পের। এত সূক্ষ্ম যে কখনো কখনো তাকে মাড়িয়ে গিয়েছে পৃথিবী, তবু সেটা অনুভব করতে পারিনি। ওর মুণ্ডটা উল্কাপিণ্ড দিয়ে তৈরি। মাঝে মাঝে কোনো কোনো ধূমকেতু সূর্যের রাজ্যে ঢুকে আর বেরতে পারে না, সূর্যের শাসনে বাঁধা প'ড়ে অনুচরের দলে ভরতি হয়। তখন যথানিয়মে তাকে সূর্য প্রদক্ষিণ করতে হয়, সেই প্রদক্ষিণ পথ এবং সময় পাকাপাকি বাঁধা হয়ে যায়।

সৌরপরিবারের এইরকম এক নূতন কুটুম্ব-ধূমকেতুর প্রদক্ষিণ পথে একদা ঘটল অপঘাত। বুধের কক্ষপথের পাশ দিয়ে যখন সে চলছিল তখন বুধের সঙ্গে টানাটানিতে তার পথের হয়ে গেল গোলমাল। রেলগাড়ি রেলচ্যুত হোলে আবার তাকে রেলে ঠেলে তোলা হয় কিন্তু টাইম-টেবিলের সময় পেরিয়ে যায়। এক্ষেত্রে তাই ঘটল। ধূমকেতুটা

হ্যালির ধূমকেতু, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ

আপন পথে যখন ফিরল তখন তার নির্দিষ্ট সময় হয়েছে উত্তীর্ণ। ধূমকেতুকে যে পরিমাণ নড়িয়ে দিতে বুধগ্রহের যতখানি টানের জোর লেগেছিল তাই নিয়ে চলল অঙ্ককষা। যার যতটা ওজন সেই পরিমাণ জোরে সে টান লাগায় এটা জানা কথা, এর থেকেই বেরিয়ে পড়ল বুধগ্রহের ওজন। দেখা গেল একুশটা বুধগ্রহের বাটখারা চাপাতে পারলে তবেই তা পৃথিবীর ওজনের সমান হয়।

বুধগ্রহের পরের রাস্তাতেই আসে শুক্রগ্রহের প্রদক্ষিণের পালা। তার ২২৫ দিন লাগে সূর্য ঘুরে আসতে। অর্থাৎ আমাদের সাড়ে সাত মাসে তার বৎসর। ওর মেরুদণ্ড-ঘোরা ঘূর্ণিপাকের বেগ কতটা তা নিয়ে এখনো তর্ক শেষ হয় নি। এই গ্রহটি বছরের এক সময়ে সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম দিগন্তে দেখা দেয়, তখন তাকে বলি সন্ধ্যাতারা, আবার এই গ্রহই আর এক সময়ে সূর্য ওঠবার আগে পুবদিকে ওঠে তখন তাকে শুকতারা বলে জানি। কিন্তু মোটেই এ তারা নয়, খুব জ্বল-জ্বল করে বলেই সাধারণের কাছে তারা খেতাব পেয়েছে। এর আয়তন পৃথিবীর চেয়ে অল্প একটু কম। এই গ্রহের পথ পৃথিবীর পথের চেয়ে আরো তিন কোটি মাইল সূর্যের কাছে। সেও কম দূর নয়। যথোচিত দূর বাঁচিয়ে আছে তবু এর ভিতরকার খবর ভালো করে পাইনে। সে সূর্যের আলোর প্রখর আবরণের জন্যে নয়। বুধকে ঢেকেছে সূর্যেরই আলো, আর শুক্রকে ঢেকেছে এর নিজেরই ঘন মেঘ। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন এই গ্রহের উত্তাপ

পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ৯০ ডিগ্রি বেশি হবার কথা। এই উত্তাপে জলের বিশেষ রূপান্তর হয় না। কাজেই ওখানে জলাশয় আর মেঘ দুইয়ের অস্তিত্বই আশা করতে পারি।

ঘোরবার পথে এই গ্রহ পৃথিবীর যখন কাছের দিকে আসে তখন একে দেখতে হয় সরু রুপোর ধনুকটির মতো। ঐ ধনুকের দুই প্রান্তের আগায় খানিকটা করে সাদা আলো দেখা যায়। এর থেকে মনে করা যেতে পারে শুক্রগ্রহের দুই মেরুতে বরফ জমেছে।

সৌরমণ্ডলীতে শুক্রগ্রহের পরের আসনটা পৃথিবীর। অন্যগ্রহদের কথা শেষ করে তারপরে পৃথিবীর খবর নেওয়া যাবে।

পৃথিবীর পরের পংক্তিতেই মঙ্গল গ্রহের স্থান। এই লাল্‌চে রঙের গ্রহটিই অন্য গ্রহদের চেয়ে পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে। এর আয়তন পৃথিবীর আট ভাগের এক ভাগ। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে এর লাগে ৬৮৭ দিন। যে পথে এ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে তা অনেকটা ডিমের মতো; তাই ঘোরার সময় একবার সে আসে সূর্যের কাছে আবার যায় দূরে। আপন মেরুদণ্ডের চারদিকে এ গ্রহের ঘুরতে লাগে পৃথিবীর চেয়ে আধ ঘণ্টা মাত্র বেশি, তাই সেখানকার দিনরাত্রি আমাদের পৃথিবীর দিনরাত্রির চেয়ে একটু বড়ো। এই গ্রহে যে পরিমাণ বস্তু আছে তা পৃথিবীর বস্তুর মাত্রার দশ ভাগের একভাগ, তাই টানবার শক্তিও সেই পরিমাণে কম।

সূর্যের টানে মঙ্গল গ্রহের ঠিক যে পথ বেয়ে চলা উচিত ছিল, তার থেকে ওর চাল একটু তফাৎ। পৃথিবীর টানে ওর এই দশা। পূর্বেই বলেছি ওজন অনুসারে টানের জোরে পৃথিবী মঙ্গলগ্রহকে কতখানি টলিয়েছে সেইটে হিসেব করে পৃথিবীর ওজন স্থির হয়েছে। এইসূত্রে সূর্যের দূরত্বও ধরা পড়ল। কেননা মঙ্গলকে সূর্যও টানছে পৃথিবীও টানছে, সূর্য কতটা পরিমাণে দূর থাকলে দুইটানে কাটাকাটি হয়ে মঙ্গলের এইটুকু বিচলিত হওয়া সম্ভব সেটা গণনা করে বের করা যেতে পারে। মঙ্গলগ্রহ বিশেষ বড়ো গ্রহ নয় তার ওজনও অপেক্ষাকৃত কম সুতরাং সেই অনুসারে টানের জোর বেশি না হওয়াতে তার হাওয়া খোওয়াবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সূর্য থেকে যথেষ্ট দূরে আছে ব'লে এতটা তাপ পায় না যাতে হাওয়ার পরমাণু গরমে উধাও হয়ে চলে যেতে পারে। কিন্তু তার হাওয়াতে কোন্ কোন্ বাষ্পের মিশোল আছে এখনো তা স্থির জানা যায়নি।

শীতকালে মঙ্গলগ্রহের মেরুদেশে খানিকটা সাদা আলো দূরবীনে চোখে পড়ে, গরমিকালে সেটা আর দেখা যায় না। অতএব ওটা যে বরফের আভাস সে কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

মঙ্গলগ্রহকে নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে একটা তর্ক চলছে অনেকদিন ধরে। একদা একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী মঙ্গলে লম্বা লম্বা আঁচড় দেখতে পেলেন, বললেন, নিশ্চয়ই এ গ্রহের বাসিন্দেরা মেরু প্রদেশ থেকে বরফ গলা জল পাবার জন্যে

খাল কেটেছে। আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানী বললেন ওটা চোখের ভুল। ইদানীং জ্যোতিষ্কলোকের দিকে মানুষ ক্যামেরা চালিয়েছে। সেই ক্যামেরা-তোলা ছবিতেও কালো দাগ দেখা দিয়েছে। কিন্তু ও-গুলো যে কৃত্রিম খাল, আর বুদ্ধিমান জীবেরই কীর্তি সেটা নিতান্তই আন্দাজের কথা। অবশ্য এ গ্রহে প্রাণী থাকা অসম্ভব নয়, কেননা এখানে হাওয়া জল আছে।

দুটি উপগ্রহ মঙ্গলগ্রহের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। একটির একপাক শেষ করতে লাগে ত্রিশ ঘণ্টা, আর একটির সাড়ে সাত ঘণ্টা, অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহের একদিনরাত্রির মধ্যে সে তাকে ঘুরে আসে প্রায় তিনবার। আমাদের চাঁদের চেয়ে এরা প্রদক্ষিণের কাজ সেরে নেয় অনেক শীঘ্র।

মঙ্গল আর বৃহস্পতিগ্রহের কক্ষপথের মাঝখানে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা দেখে পণ্ডিতেরা সন্দেহ করে খোঁজ করতে লেগে গেলেন। প্রথমে অতি ছোটো চারটি গ্রহ দেখা দিল। তারপরে দেখা গেল ওখানে বহু হাজার টুক্‌রো গ্রহের ভিড়। ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ঘুরছে সূর্যের চারিদিকে। ওদের নাম দেওয়া যাক গ্রহিকা। ইংরেজিতে বলে asteroids। প্রথম যার দর্শন পাওয়া গেল তার নাম দেওয়া হয়েছে সৗরিস (Ceres), তার ব্যাস চারশো পঁচিশ মাইল। ঈরোস (Eros) ব'লে একটি গ্রহিকা আছে সূর্য প্রদক্ষিণের সময় এ পৃথিবীর যত কাছে আসে, এমন আর কোনো গ্রহই আসে না। এরা এত ছোটো যে এদের ভিতরকার কোনো বিশেষ

খবর পাওয়া যায় না। এদের সবগুলোকে জড়িয়ে যে ওজন পাওয়া যায় তা পৃথিবীর ওজনের সিকি ভাগেরও কম।

অধিকাংশ গ্রহিকা থেকে যে আলো পাই তা ভাঙা অসমান টুক্‌রো থেকে প্রতিফলিত আলোর মতো। অল্পই কয়েকটি আছে যারা গ্রহদের মতো গোলাকার। টুক্‌রো-গুলোকে কোনো একটা আস্ত গ্রহেরই ভগ্নশেষ ব'লে মনে করা যেতে পারে। নিজের ভিতরকারই কোনো উৎপাত কিংবা প্রতিবেশী কোনো গ্রহের আঘাত লেগে একদা এর একটা বিপ্লবের সময় গিয়েছে ; সেই ইতিহাস-বিস্মৃত দুর্যোগ আপন অখ্যাত আবর্জনাগুলোকে সূর্যের চারিদিকে ঘুর খাইয়ে কোনোমতে রীত রক্ষা করছে।

এই গ্রহিকাদের প্রসঙ্গে আর একদলের কথা বলা উচিত। তারাও অতি ছোটো, তারাও ঝাঁক বেঁধে চলে এবং নির্দিষ্ট পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণও করে থাকে, তারা উল্কাপিণ্ডের দল। পৃথিবীতে ক্রমাগতই তাদের বর্ষণ চলছে, ধুলার সঙ্গে তাদের যে ছাই মিশছে সে বড়ো কম নয়। পৃথিবীর উপরে হাওয়ার চাঁদোয়া না থাকলে এই সব ক্ষুদ্র শত্রুর আক্রমণে আমাদের রক্ষা থাকত না।

উল্কাপাত দিনে রাতে কিছু না কিছু হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ মাসের বিশেষ বিশেষ দিনে উল্কাপাতের ঘটা হয় বেশি। ২১শে এপ্রিল, ৯, ১০, ১১ই অগস্ট, ১২, ১৩, ১৪ই ও ২৭শে নভেম্বরের রাত্রে এই উল্কাবৃষ্টির আতশ বাজি

দেখবার মতো জিনিস। এ সম্বন্ধে দিনক্ষণের বাঁধাবাঁধি দেখে বিজ্ঞানীরা কারণ খোঁজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই, ওদের একটা বিশেষ পথ আছে। কিন্তু গ্রহদের মতো ওরা একা চলে না, ওরা দলবাঁধা জাত। লক্ষ লক্ষ চলেছে ভিড় করে এক রাস্তায়। বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে পৃথিবীর রাস্তা গিয়ে পড়ে ঠিক ওদের যেখানে জটলা। পৃথিবীর টান ওরা সামলাতে পারে না। রাশি রাশি বর্ষণ হোতে থাকে; পৃথিবীর ধুলোয় ধুলো হয়ে যায়। কখনো কখনো বড়ো বড়ো টুকরোও পড়ে, ফেটে ফুটে গিয়ে চারিদিক ছারখার করে দেয়। সূর্যের এলেকায় অনধিকার প্রবেশ করে বিপন্ন হয়েছে এমন ধূমকেতুর এরা ছুর্ভাগ্যের নিদর্শন। এমন কথাও শোনা যায় তরুণ বয়সে পৃথিবীর অন্তরে যখন তাপ ছিল বেশি, তখন অগ্ন্যুৎপাতে পৃথিবীর ভিতরের সামগ্রী এত ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল যে পৃথিবীর টান এড়িয়ে গিয়ে সূর্যের চারদিকে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে নাগাল পেলেই আবার তাদের পৃথিবী নেয় টেনে। বিশেষ বিশেষ দিনে সেই উল্কার যেন হরির লুট হোতে থাকে।

এই অতি ক্ষুদ্রদের পরের রাস্তাতেই দেখা দেয় অতি বৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতি।

এই বৃহস্পতি গ্রহের কাছ থেকে, কোনো পাকা খবর প্রত্যাশা করার পূর্বে ছুটি জিনিস লক্ষ্য করা দরকার। সূর্য থেকে তার দূরত্ব, আর তার আয়তন। পৃথিবীর দূরত্ব ন

কোটির কিছু উপর আর বৃহস্পতির দূরত্ব ৪৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর দূরত্বের চেয়ে পাঁচ গুণেরও বেশি। এত দূর থেকে এ গ্রহ সূর্যের তাপ খুবই কম পায়, পৃথিবী যা পায়, তার পঁচিশ ভাগেরও এক ভাগ। এত কম তাপে এর জলীয় বা বাষ্পীয় জিনিস বরফ হয়ে যাবার কথা। তাই কেউ কেউ বলেন বৃহস্পতি বরফ-জমা গ্রহ। অন্যেরা একেবারে উল্‌টো কথা বলে থাকেন। তাঁদের কথাটা বুঝিয়ে বলা যাক। আদিমকালে নক্ষত্র আর গ্রহ এক জাতেরই ছিল এ কথা জানা। অর্থাৎ তারা ছিল স্বপ্রকাশিত, নিজেরই আলোক উত্তাপের সম্পদে ধনী। কিন্তু ছোটো তহবিল প্রায় শেষ করে ফেলাতেই গ্রহেরা নক্ষত্রদের সঙ্গে ভিন্ন পংক্তিতে পড়ে গেছে। আজ প্রায় একমাত্র সূর্যের কাছ থেকেই ওদের আলো তাপের বরাদ্দ। এ অবস্থায় বরাদ্দ অতিরিক্ত কম পড়লে ওরা ঠাণ্ডায় জমে যাবে না তো কী। বৃহস্পতির ভাগে বরাদ্দ কম পড়েছে সন্দেহ নেই। অন্যদিকে বলবার কথা এই যে বৃহস্পতি অতিকায় গ্রহ, ওর ব্যাস প্রায় ৯০ হাজার মাইল,আয়তন পৃথিবীর ১,৩০০ গুণ বড়ো। এত বড়ো গ্রহ প্রভূত তাপের যে পাথেয় নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেছিল সম্ভবত তার অনেকটা জমা আছে ওর ভিতরে। আজও তাই খরচ করেই চলছে। তাই যদি না হবে, তাহোলে ওর আবরণে যে প্রবল চাঞ্চল্য দূরবীনে ধরা পড়েছে তা সম্ভব হোলো কী করে। সবাই জানে অস্থিরতা জন্মায় তাপের থেকেই। এই তো কিছুকাল পূর্বে প্রকাণ্ড লাল বর্ণের দাগ বৃহস্পতির গায়ে দেখা

দিয়েছিল সেটা ছিল লম্বায় ত্রিশ হাজার মাইল, চওড়ায় সাত হাজার। ক্রমে সেটা প্রায় এসেছে মিলিয়ে। অবস্থার এরকম হেরফের ঠাণ্ডা অবস্থায় সম্ভব হয় না। এ পক্ষে আরো একটা যুক্তি আছে, আয়তনে বৃহস্পতি পৃথিবীর চেয়ে ১৩০০ গুণ বড়ো হওয়া সত্ত্বেও ওজনে ওর চেয়ে কেবলমাত্র তিনশো ষোলোগুণ মাত্র ভারি। উত্তাপ না থাকলে ওব সমস্ত সামগ্রী ঘন হয়ে যেত অনেক বেশি, হাল্‌কা থাকতে পারত না।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের ঝড় তুফান পৃথিবীর ঝড় তুফানের চেয়ে অনেক প্রবল। অথচ সূর্যের উত্তাপ আমরা যা পাই তার ২৫ ভাগের এক ভাগ মাত্র পায় এ গ্রহ। কাজেই এ কথা বলা চলে না যে অল্প উত্তাপে সেখানে এত বড়ো আন্দোলন। তাই বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ বলেন যে প্রচণ্ড উত্তাপে সূর্যের মধ্যে যেমন সর্বদা একটা বিরাট তোলপাড় চলছে, তেমনি পূর্বের জমানো উত্তাপেই এ গ্রহেও ঝড় তুফানের প্রবলতা। বৃহস্পতির নিজের তাপ থাকতে পারে কিন্তু নিজের আলো নেই। এ গ্রহও অন্য গ্রহের মতোই আলোর জন্যে মুখ চেয়ে থাকে সূর্যের।

সূর্য প্রদক্ষিণ করতে বৃহস্পতির লাগে প্রায় বারো বৎসর। দূরে থাকাতে ওর কক্ষপথ পৃথিবী থেকে অনেক বড়ো সন্দেহ নেই কিন্তু ও চলেও যথেষ্ট মন্দ গমনে। পৃথিবী যেখানে উনিশ মাইল চলে এক সেকেণ্ডে, ও চলে আট মাইল মাত্র। কিন্তু ওর স্বাবর্তন অর্থাৎ নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে ঘোরা খুবই দ্রুত বেগে। অত বড়ো বিপুল দেহটাকে পাক খাওয়াতে

ওর লাগে দশ ঘণ্টা। আমাদের একদিন একরাত্রি সময়ের মধ্যে ওর দুই দিনরাত্রি শেষ হয়েও উদ্বৃত্ত থাকে।

দশটি উপগ্রহ নিয়ে বৃহস্পতির পরিবারমণ্ডলী। পৃথিবীর চাঁদের চেয়ে এদের বৃহস্পতি প্রদক্ষিণ বেগ অনেক বেশি দ্রুত। প্রথম চারটি গ্রহ আমাদেরই চাঁদের মতো বড়ো। তাদেরও আছে অমাবস্যা পূর্ণিমা এবং ক্ষয়বৃদ্ধি।

বৃহস্পতিগ্রহে হাওয়া বদল করতে যাবার লোভ কোনো কোনো দুঃসাহসিকের মনে উদয় হোতে পারে। এ খবরটা তাদের রাখা উচিত যে ওর হাওয়ায় দুটি গ্যাস মিশিয়ে আছে অ্যামোনিয়া আর আলেয়া গ্যাস। স্মেলিংসল্ট নামক জিনিসের পরিচয় হয়তো অনেকের আছে, অত্যন্ত ঝাঁঝালো তার গন্ধ। সর্বদা এটা ঘ্রাণ করা সুখকর নয়। আমাদের দেশে পোড়ো মাঠে রাত্রে আলেয়ার আলো চলে বেড়াতে দেখে পথিকরা ভয় পেয়ে এসেছে। পচা গাছপালায় যে বাষ্প বেরয় তারি থেকে এর উৎপত্তি। নিশ্বাসে এ বাষ্পের সংস্রব যে স্বাস্থ্যকর হবে না সে কথা বলা বাহুল্য।

আলো যে এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে ছুটে চলে তা প্রথম স্থির হয় বৃহস্পতির চন্দ্রগ্রহণ দেখে। হিসাব মতো বৃহস্পতির উপগ্রহের গ্রহণ যখন ঘটবার কথা প্রত্যেক বারে তার কিছুকাল পরে ঘটতে দেখা যায়। তার কারণ, ওর আলো আমাদের চোখে পড়তে কিছু দেরি করেছে। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় নিয়ে আলো চলে, এ যদি না হোত তাহোলে গ্রহণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণের ঘটনাটা

দেখা যেত। পৃথিবী থেকে এই উপগ্রহের দূরত্ব মেপে ও গ্রহণের মেয়াদ কিছু পেরিয়ে সেটা গোচর হওয়া লক্ষ্য করে আলোর বেগ প্রথম হিসাব করা হয়।

বৃহস্পতির নিজস্ব আলো নেই তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৃহস্পতির দশ দশটি উপগ্রহের গ্রহণের সময়। গ্রহণটা হয় কী করে ভেবে দেখো। কোনো এক যোগাযোগে যখন সূর্য থাকে পিছনে, আর গ্রহ থাকে আলো আড়াল করে সূর্যের সামনে, আর তারো সামনে থাকে গ্রহের ছায়ায় উপগ্রহ, তখনি সূর্যালোক পেতে বাধা পেয়ে উপগ্রহে লাগে গ্রহণ। কিন্তু মধ্যবর্তী গ্রহের নিজেরই যদি আলো থাকত, তা হোলে সেই আলো পড়ত উপগ্রহে, গ্রহণ হোতেই পারত না। আমাদের চাঁদের গ্রহণেও সেই একই কথা। চাঁদের কাছ থেকে সূর্যকে যখন সে আড়াল করে, তখন জ্যোতিহীন পৃথিবী চাঁদকে ছায়াই দিতে পারে, নিজের থেকে আলো দিতে পারে না।

বৃহস্পতিগ্রহের পরের পংক্তিতে আসে শনিগ্রহ।

এ গ্রহ আছে সূর্য থেকে ৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে আর ২৯৷৷০ বছরে এক পাক তার সূর্য প্রদক্ষিণ। শনির বেগ বৃহস্পতির চেয়েও কম—এক সেকেণ্ডে ছ মাইল মাত্র। বৃহস্পতি ছাড়া সৌরজগতের অন্য গ্রহের চেয়ে এর আকার অনেক বড়ো; এর ব্যাস পৃথিবীর প্রায় ৯ গুণ। পৃথিবীর চেয়ে নয়গুণ বড়ো হয়েও এক পাক ঘুর খেতে ওর লাগে পৃথিবীর চেয়ে অর্ধেকেরও কম সময়। এত জোরে ঘুরছে
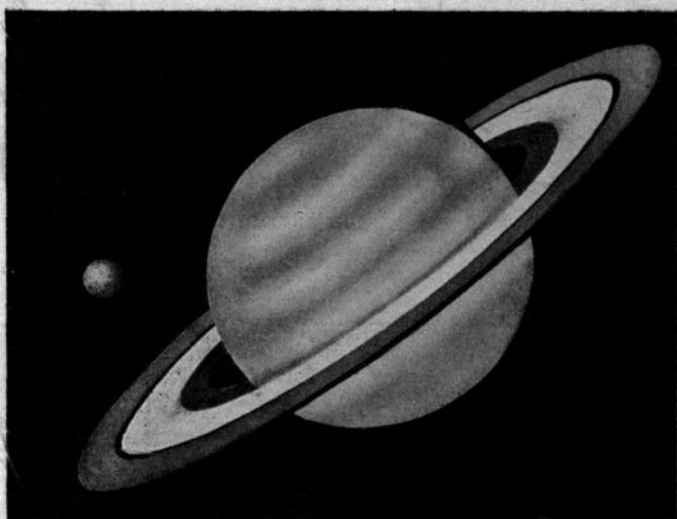
শনি ও পৃথিবীর আয়তনের তুলনা

ব'লে সেই বেগের ঠেলায় এর আকার হয়েছে কিছু চ্যাপটা ধরণের। এত বড়ো এর আয়তন কিন্তু ওজন পৃথিবীর ৯৫ গুণ মাত্র বেশি। যে জিনিস দিয়ে এ গ্রহ তৈরি তা জলের চেয়েও হালকা। এর উপাদান এত হালকা ব'লে এই প্রকাণ্ড আয়তন সত্ত্বেও টানবার শক্তি পৃথিবীর চেয়ে বেশি নয়। একটি মেঘের আবরণ একে ঘিরে আছে, যার আকার বদল মাঝে মাঝে দেখা যায়।

শনির উপগ্রহ আছে দশটি। সব চেয়ে বড়ো যেটি, আয়তনে সে বুধগ্রহের চেয়েও বড়ো। প্রায় আট লক্ষ মাইল দূরে থাকে, ষোলো দিনে তার প্রদক্ষিণ শেষ হয়।

বৃহস্পতির সম্বন্ধে যে তর্ক এ গ্রহের সম্বন্ধেও তাই। এত বড়ো আয়তন সত্ত্বেও এ গ্রহ এত হাল্‌কা তার এই একটা কারণ আন্দাজ করা যায় যে, আদিকালের যে তাপ এর অন্তরে সঞ্চিত আছে তাই রেখেছে এর সমস্ত সামগ্রীকে হালকা করে। দূরবীনে দেখা যায় কয়েকটি জ্যোতির্ময় পাগড়ির পাক এর চারদিক ঘিরে আছে। এরা কী দিয়ে তৈরি পণ্ডিত-দের কাছে সে একটা বড়ো সমস্যা ছিল। এদের নিরেট বেষ্টনী ব'লে মনে করা যায় না, কারণ এ গ্রহের প্রবল টানে না ভেঙে স্থির থাকতে পারে এমন শক্ত জিনিস কল্পনাও করতে পারি না।

শনিগ্রহের বেষ্টনীর বর্ণচ্ছটা পরীক্ষায় দেখা গেছে যে এই বেষ্টনীর যে সব অংশ গ্রহের কাছাকাছি আছে তাদের চলন-বেগ বাইরের দূরবর্তী অংশের চেয়ে অনেক বেশি। বেষ্টনী

যদি অখণ্ড চাকার মতো হোত, তাহোলে ঘূর্ণি চাকার নিয়মে বেগটা বাইরের দিকেই বেশি হোত। কিন্তু শনির বেষ্টনী যদি খণ্ড খণ্ড জিনিস নিয়েই হয় তাহোলে তাদের যে দল গ্রহের কাছে, টানের জোরে তারাই ঘুরবে বেশি বেগে। এই সব লক্ষ লক্ষ টুকরো উপগ্রহ ছাড়াও দশটি বড়ো উপগ্রহ ভিন্ন পথে শনিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে।

কী করে যে এ গ্রহের চারদিকে দলে দলে ছোটো ছোটো টুকরোর সৃষ্টি হোলো, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যে মত তারই কিছু এখানে বলা যাক। গ্রহের প্রবল টানে কোনো উপগ্রহই আপন গোল আকার রাখতে পারে না, শেষ পর্যন্ত অনেকটা তার ডিমের মতো চেহারা হয়। অবশেষে এমন এক সময় আসে যখন টান আর সহ্য করতে না পেরে উপগ্রহ ভেঙে দু-টুকরো হয়ে যায়। এই ছোটো টুকরো দুটিও আবার ভাঙতে থাকে। এমনি করে ভাঙতে ভাঙতে একটিমাত্র উপগ্রহ থেকে লক্ষ লক্ষ টুকরো বেরনো অসম্ভব নয়। চাঁদেরও একদিন এই দশা হবার কথা। বিজ্ঞানীরা বলেন যে প্রত্যেক গ্রহকে ঘিরে আছে একটি করে অদৃশ্য মণ্ডলীর বেড়া, তাকে বলে বিপদের গণ্ডি। তার মধ্যে এসে পড়লেই উপগ্রহের দেহ ফেঁপে উঠে ডিমের মতো লম্বাটে আকার ধরে। তারপরে থাকে ভাঙতে। শেষকালে টুকরোগুলো জোট বেঁধে ঘুরতে থাকে গ্রহের চারদিকে। বিজ্ঞানীদের মতে বৃহস্পতির প্রথম উপ-গ্রহ এই অদৃশ্য বিপদগণ্ডির কাছে এসে পড়েছে, আর কিছু-দিন পরে সেখানে ঢুকলেই খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। শনিগ্রহের

মতো বৃহস্পতির চারদিক ঘিরে তখন তৈরি হবে একটি উজ্জ্বল বেষ্টনী। শনিগ্রহের চারদিকে যে বেষ্টনীর কথা বলা হোলো তার সৃষ্টি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা আন্দাজ করেন যে অনেকদিন আগে শনির একটি উপগ্রহ ঘুরতে ঘুরতে এর বিপদ গণ্ডির ভিতরে গিয়ে পড়েছিল তার ফলে উপগ্রহটা ভেঙে টুকরো হয়ে আজও এই গ্রহের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পৃথিবীর বিপদগণ্ডিব অনেকটা বাইরে আছে ব'লে চাঁদের যা পরিবর্তন হয়েছে তা খুব বেশি না। পৃথিবীর টানের জোরে আস্তে আস্তে চাঁদ তার কাছে এগিয়ে আসছে,তারপরে যখন এই বেড়ার মধ্যে অপঘাতের এলেকায় প্রবেশ করবে তখন যাবে টুকরো টুকরো হয়ে, আর সেই টুকরোগুলো পৃথিবীর চারদিক ঘিরে শনিগ্রহের নকল করতে থাকবে, তখন হবে তার শনির দশা।

শনিগ্রহের পরের মণ্ডলীতে আছে য়ুরেনস নামক এক নতুন-খবর-পাওয়া গ্রহ।

এ গ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছু জানা সম্ভব হয় নি। এর ব্যাস পৃথিবীর ৬৪ গুণ বেশি। সূর্য থেকে ১৭৮ কোটি ২৮ লক্ষ মাইল দূরে থেকে সেকেণ্ডে চার মাইল বেগে ৮৪ বছরে একবার তাকে প্রদক্ষিণ করে। এত বড়ো এর আয়তন, কিন্তু খুব দূরে আছে ব'লে দূরবীন ছাড়া একে দেখাই যায় না। যে জিনিসে এ গ্রহ তৈরি তা' জলের চেয়ে একটু ঘন, তাই পৃথিবী থেকে ৬৪ গুণ বড়ো হোলেও, এর ওজন পৃথিবীর ১৫ গুণ মাত্র। সূর্যের যে আলো এ গ্রহ থেকে প্রতিফলিত হয়ে

আমাদের কাছে আসছে তার বর্ণচ্ছটা, পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা বলছেন যে এর চারদিকে ঘিরে আছে এক অদ্ভুত হাওয়া, সে আমাদের কাছে একেবারে নূতন। ১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে এ গ্রহ একবার ঘুরপাক খাচ্ছে। চারিটি উপগ্রহ নিজ নিজ পথে ক্রমাগত একে প্রদক্ষিণ করছে।

য়ুরেনস আবিষ্কারের কিছুকাল পরেই পণ্ডিতেরা য়ুরেনসের বেহিসাবি চলন দেখে স্থির করলেন, এ গ্রহ পথের নিয়ম ভেঙেছে আর একটা কোনো গ্রহের টানে। খুঁজতে খুঁজতে বেরোল সেই গ্রহ। তার নামকরণ হোলো নেপচুন।

সূর্য থেকে এর দূরত্ব ২৭৯ কোটি ৩৫ লক্ষ মাইল, প্রায় ১৬৪ বছরে এ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এর ব্যাস প্রায় ৩৩,০০০ মাইল, য়ুরেনসের চেয়ে কিছু বড়ো। দূরবীনে শুধু ছোটো একটি সবুজ থালার মতো দেখায়। একটি উপগ্রহ ২ লক্ষ ২২ হাজার মাইল দূরে থেকে ৫ দিন ২১ ঘণ্টায় একে একবার ঘুরে আসছে। উপগ্রহের দূরত্ব এবং এই গ্রহের আয়তন থেকে হিসাব করা হয়েছে যে এর বস্তু পদার্থ জল থেকে কিছু ভারি, ওজনে প্রায় য়ুরেনসের সমান। কত বেগে এ গ্রহ মেরুদণ্ডের চারদিক ঘুরছে তা আজও একেবারে ঠিক হয় নি, তবে পণ্ডিতদের মধ্যে একজন বলেন যে ৭ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট এর ঘূর্ণির কাল। তাঁর মত মেনে নিলে বলতে হবে যে সৌরজগতের মধ্যে এই গ্রহই সব চেয়ে বেগে ঘুর খাচ্ছে।

নেপচুনের আকর্ষণে য়ুরেনসের যে নূতন পথে চলার কথা তা হিসেব করার পরেও দেখা গেল যে য়ুরেনস ঠিক সে পথ ধরেও চলছে না। তার থেকে বোঝা গেল যে নেপচুন ছাড়া এ গ্রহের গতিপথের বাইরে রয়েছে আরো একটা জ্যোতিষ্ক। ১৯৩০ সালে বেরিয়ে পড়ল নূতন এক গ্রহ। তার নাম দেওয়া হোলো প্লুটো। এ গ্রহ এত ছোটো ও এত দূরে, যে দূরবীনেও একে অনেক কষ্টে দেখা যায়। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে নিঃসন্দেহে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। এ গ্রহই সূর্য থেকে সব চেয়ে দূরে, তাই আলো উত্তাপ পাচ্ছে এত কম যে এর অবস্থা আমরা কল্পনাও করতে পারিনে।

প্রায় ৩৯৬ কোটি মাইল দূর থেকে ২৫০ বছরে এ গ্রহ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এর আয়তন প্রায় মঙ্গল গ্রহের মতো কিন্তু ওজন সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতের কোনো মিল নেই। য়ুরেনসের গতিপথের পরিবর্তন দেখে অনেকে হিসেব করেছেন যে এর ওজন হবে পৃথিবীর ৬ গুণ। এত ছোটো আকার অথচ ওজন পৃথিবীর ছ-গুণ হোতে হোলে এর বস্তু পদার্থ যে পরিমাণ ঘনীভূত হবার কথা সে রকম ঘন পদার্থের সঙ্গে আমাদের এখনো পরিচয় ঘটেনি।

পৃথিবী

অন্যগ্রহের আকারের ও চলাফেরার কিছু কিছু খবর জমেছে, কেবল পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যার শরীরের গঠনরীতি আমরা পুরোপুরি অনেকটা জানতে পেরেছি। গ্যাসীয় অবস্থা পেরিয়ে যখন থেকে তার দেহ আঁট বেঁধেছে তখন থেকেই সর্বাঙ্গে তার ইতিহাসের নানা সংকেতচিহ্ন আঁকা পড়ছে।

পৃথিবীর উপরকাব স্তবে কোনো ঢাকা না থাকাতে সেই ভাগটা শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হোলো, আর ভিতরের স্তর গরম থাকায় সেখানে রয়ে গেল তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ। দুধের সর ঠাণ্ডা হোতে হোতে যেমন কুঁচকিয়ে যায়, পৃথিবীর উপরকার স্তর ঠাণ্ডা হোতে হোতে তেমনি কুঁচকিয়ে যেতে লাগল। কুঁচকিয়ে গেলে দুধের সর যেটুকু অসমান হয় সে আমরা গণ্যই করিনে। কিন্তু কুঁচকিয়ে যাওয়া পৃথিবীর স্তরের অসমানতা তেমন সামান্য ব'লে উড়িয়ে দেবার নয়। নিচের স্তর এই অসমানতার ভার বইবার মতো পাকা হয়নি। তাই ভালো নির্ভর না পাওয়াতে উপরের শক্ত স্তবটা ভেঙে তুবড়ে উঁচুনিচু হোতে থাকল, দেখা দিল পাহাড় পর্বত। বুড়ো মানুষের কপালের চামড়া কুঁচকে যেমন বলি পড়ে, তেমনি এগুলো যেন পৃথিবীর উপরকার চামড়ার বলি। সমস্ত পৃথিবীর বৃহৎ

গভীরতার তুলনায় এই পাহাড় পর্বত মানুষের চামড়ার উপরে বলিচিহ্নের চেয়ে কম বই বেশি নয়।

প্রাচীন যুগের পৃথিবীতে কুঁচকে যাওয়া স্তরের উঁচুনিচুতে কোথাও নামল গহ্বর, কোথাও উঠল পর্বত। গহ্বরগুলো তখনও জলে ভরতি হয়নি। কেননা তখনো পৃথিবীর তাপে জলও ছিল বাষ্প হয়ে। ক্রমে মাটি হোলো ঠাণ্ডা, বাষ্প হোলো জল। সেই জলে গহ্বর ভরে উঠে হোলো সমুদ্র।

পৃথিবীর অনেকখানি জলের বাষ্প তো তরল হোলো; কিন্তু হাওয়ার প্রধান গ্যাসগুলো গ্যাসই রয়ে গেল। তাদের তরল করা সহজ নয়। যতটা ঠাণ্ডা হোলে তারা তরল হোতে পারত ততটা ঠাণ্ডায় জল যেত জমে, আগাগোড়া পৃথিবী হোত বরফের বর্মে আবৃত। মাঝারি পরিমাণের গরমে ঠাণ্ডায় অক্সিজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতি বাতাসের গ্যাসীয় জিনিসগুলি চলাফেরা করছে সহজে, আমরা নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচছি। পৃথিবীর ভিতরের দিকে সংকোচন এখনো একেবারে থেমে যায়নি। তারি নড়নের ঠেলায় হঠাৎ কোথাও তলার জায়গা যদি নিচে থেকে কিছু সরে যায়, তাহোলে উপরের শক্ত আবরণ ভেঙে গিয়ে তার উপরে চাপ দিয়ে পড়ে, দুলিয়ে দেয় পৃথিবীর স্তরকে, ভূমিকম্প জেগে ওঠে। আবার কোনো কোনো জায়গায় ভাঙা আবরণের চাপে নিচের তপ্ত তরল জিনিস উপরে উছলে ওঠে। ফাটল বেরিয়ে পড়ে, আগ্নেয় পর্বত, তেল সঞ্চয়ের খনি, উষ্ণ প্রস্রবণ দেখা দেয়।

পৃথিবীর ভিতরের অবস্থা জানতে গেলে যতটা খুঁড়ে দেখা দরকার এখনো ততটা নিচে পর্যন্ত খোঁড়া হয়নি। কয়লার খোঁজে মানুষ মাটির যতটা নিচে নেমেছে সে এক মাইলের অধিক বেশি নয়। তাতে কেবল এই খবরটা পাওয়া গেছে যে যত পৃথিবীর নিচের দিকে যাওয়া যায় একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় গরম বাড়তে থাকে। আরো নিচে গরম যে কত সে তো বোঝা যায় পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির কাণ্ড দেখলে। কিন্তু এসব তপ্ত উৎসেরও গভীরতা পৃথিবীর স্থূলতার তুলনায় অল্পই। মানুষের কাছে পৃথিবীর ভিতরকার খবরটা আরো কিছু জানা গেছে ভূমিকম্পে।

মাটির নিচে কোথাও তোলাপাড়ার সৃষ্টি হোলে সেখানে ঢেউ উঠে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে, জলে ঢিল ফেললে ঢেউ যেমন চাকার পর চাকার রেখায় এগোতে থাকে। Seismograph অর্থাৎ ভূকম্পলিপি নামক একটা যন্ত্র বের হয়েছে, তার পটে এ সব ঢেউ উঁচু নিচু চিহ্ন আঁকে, তার থেকে তাদের কাঁপনের বেগ ধরা পড়ে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের পরীক্ষাগারে এই যন্ত্র আছে। কোন্ সময়ে কোথায় সীস্‌মোগ্রাফে ভূকম্পের রেখা আঁকা পড়ে তার হিসাব করে দেখলে দেখা যায় পৃথিবীর কঠিন স্তরের ভিতর দিয়ে কী পরিমাণে বেগে কাঁপন চালাচালি হয়। পৃথিবীর সমস্ত ভিতরটা যদি একই পদার্থে গড়া হোত তাহোলে চলন-বেগের মাপে তফাৎ থাকত না। কিন্তু তফাৎ দেখতে পাই। পৃথিবীর গভীর তলায় কাঁপনের ঢেউ উপরকার তলার চেয়ে

জোর বেগে চলে। বস্তুত পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভূকম্প ভিন্ন ভিন্ন মাপের। তরল বা বাষ্পীয় পদার্থের ভিতর দিয়ে কাঁপনের ঢেউ যে ভাবে ছড়ায় কঠিন পদার্থে সে ভাবে হয় না। এই বিচারে জানা গেছে পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্রকুণ্ডটির প্রায় দু'হাজার মাইল চারদিক পর্যন্ত ভূস্তর কঠিন। কেন্দ্র-কুণ্ডটি জলের চেয়ে দশ বারো গুণ ভারি কোনো তরল পদার্থে পূর্ণ।

পৃথিবীর চারদিক ঘিরে মস্ত একটি অদৃশ্য আবরণ আছে। তাকেই বলি বাতাস। পৃথিবীর সৃজনে পালনে এবং অনেক সময় ধ্বংসনে এই লঘু জিনিসের প্রাধান্য গুরুতর। নাইট্রোজেন (শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ), অক্সিজেন (প্রায় ২৩ ভাগ), জলীয় বাষ্প ; আঙার গ্যাস (কার্বনিক অ্যাসিড) এবং আরো কয়েকটি গ্যাস মিশে তৈরি করেছে হাওয়া। জলীয় বাষ্প ও আঙার গ্যাস ছাড়া বাকি সবই মৌলিক জিনিস। জলীয়বাষ্পে আছে জল ; আঙার গ্যাসে মিশে আছে অক্সিজেন গ্যাস।

বড়ো বড়ো ডানা-ওয়ালা পাখি শুধু ডানা ছড়িয়েই অনেকক্ষণ ধরে হাওয়ার উপর ভেসে বেড়ায়, বুঝতে পারি পাখিকে নির্ভর দিতে পারে এতটা ঘনতা আছে বাতাসের। বস্তুত কঠিন ও তরল জিনিসের মতোই হাওয়ারও ওজন মেলে। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত হাওয়া আছে অনেক মাইল ধরে। সেই হাওয়ার চাপ একফুট লম্বা ও একফুট চওড়া জিনিসের উপর প্রায় সাতাশ মোন। একজন সাধারণ

মানুষের শরীরে চাপ পড়ে প্রায় ৪০০ মোনের উপর। তবুও তা টের পাইনে। যেমন উপর থেকে তেমনি নিচের থেকে, যেমন এ পাশ থেকে তেমনি ও পাশ থেকে সমানভাবে বাতাসের চাপ ও ঠেলা লাগছে ব'লে বাতাসের ভার আমাদের পীড়া দিচ্ছে না।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আপন আবরণে দিনের বেলায় সূর্যের তাপ অনেকটা ঠেকিয়ে রাখে, আর রাত্রিতে মহাশূন্যের প্রবল ঠাণ্ডাটাকেও বাধা দেয়। চাঁদের গায়ে হাওয়ার উড়ুনি নেই তাই সে সূর্যের তাপে ফুটন্ত জলের সমান গরম হয়ে ওঠে। অথচ গ্রহণের সময় পৃথিবী যেই চাঁদের উপর ছায়া ফেলে অমনি দেখতে দেখতেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। হাওয়া থাকলে তাপটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত। চাঁদেব কেবল এইমাত্র অভাব নয়, বাতাস নেই ব'লে সে একেবারে বোবা, কোথাও একটু শব্দ হবার জো নেই। বিশেষভাবে নাড়া পেলে বাতাসে নানা আয়তনের সূক্ষ্ম ঢেউ ওঠে, সেইগুলো নানা কাঁপনের ঘা দেয় আমাদের কানের ভিতরকার পাতলা চামড়ায়, তখন সেই সব ঢেউ নানা রকম আওয়াজ হয়ে আমাদের কাছে সাড়া দিতে থাকে। চাঁদে হাওয়া নেই আবার কানওয়ালা জীবও নেই; তাই এত বড়ো প্রকাণ্ড জায়গায় পর্বত গুঁড়িয়ে গেলেও তার থেকে টুঁ শব্দটি হয় না, হোলেও সে শব্দটি পৌঁছয় না কারো কাছে। আরো একটি কাজ আছে বাতাসের। সে ফরাশের মতো সূর্যের উগ্র কিরণকে বিছিয়ে মেলে দেয়।

নইলে যেখানটিতে রোদ পড়ত সেইখানেই আলো হোত তীব্র, আর ঠিক তার পাশেই থাকত ঘোর অন্ধকার। গাছের মাথার উপর রোদ্দুর উঠত চোখ রাঙিয়ে আর তার তলা হোত মিশমিশে কালো, ঘরের ছাদে ঝাঁ ঝাঁ করত তুই পহরের রোদের তেজ, ঘরের ভিতর থাকত অমাবস্যার রাত্রি। প্রদীপ জ্বালার কথা চিন্তা করাই হোত মিথ্যে, কেননা পৃথিবীর বাতাসে অক্সিজেন গ্যাসের সাহায্যেই সব কিছু জ্বলে।

আমরা প্রশ্বাসে টানি বাতাসের অক্সিজেন। তার অণু আমাদের প্রাণবস্তুর অণুর সঙ্গে মিশে ধীরে ধীরে তাকে অদৃশ্য জ্বলনে জ্বালাতে থাকে। তাই যতদিন বেঁচে থাকি রক্ত থাকে গরম।

এই জ্বলনের থেকে যে আঙারের বাষ্প ওঠে, আমাদের পক্ষে সেটা বিষ, তাই নিশ্বাসে তাকে বের করে দিতে হয়। যে কোনো পদার্থই পোড়ে তার থেকে এই অক্সিজেনে মেশা আঙারের গ্যাস উঠে বাতাসে যায় ছড়িয়ে। কার্বনিক গ্যাস অর্থাৎ আঙারের গ্যাস হচ্ছে দগ্ধ কয়লার গ্যাসীয় অবস্থা। এতদিনে এই আঙারের গ্যাসে বাতাস ভরে যেত, পৃথিবীতে টেঁকা দায় হোত। কিন্তু সবুজ গাছপালা আঙারের অংশ নেয় পুষ্টির জন্যে, ছেড়ে দেয় অক্সিজেন। ওরা বাঁচে না এই গ্যাসের আঙার নইলে, আমরা বাঁচিনে অক্সিজেন নইলে। বাতাসটাকে ভাগাভাগি করে ভোগ করি। তাতে উভয় পক্ষেরই সমান সুবিধে।

বাতাসকে যৌগিক পদার্থ বলা চলে না, ওটা মিশোল জিনিস। নানা গ্যাস মিশেছে কিন্তু মেলেনি, একত্রে আছে, এক হয়নি। বাতাসে যে পরিমাণ অক্সিজেন তার তিনগুণ আছে নাইট্রোজেন। কেবলমাত্র নাইট্রোজেন থাকলে দম আটকিয়ে মরে যেতুম। কেবলমাত্র অক্সিজেন থাকলে আমাদের প্রাণবস্তু পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যেত। এই প্রাণবস্তু কিছু পরিমাণ জ্বলে, আবার জ্বলতে কিছু পরিমাণ বাধা পায়, তবেই আমরা দুই বাড়াবাড়ির মাঝখানে থেকে বাঁচতে পারি।

সমস্ত বায়ুমণ্ডল জলে স্যাঁৎসেঁতে। যে জল থাকে মেঘে, তার চেয়ে অনেক বেশি জল আছে হাওয়ায়। আমাদের সমস্ত শরীর কিছু কিছু করে এই জল শুষে নিচ্ছে। অত্যন্ত শুকনো হাওয়ায় চামড়া শুকিয়ে যখন ফাটতে থাকে, তখন তার প্রমাণ পাই।

স্বচ্ছ বায়ুমণ্ডলকে দেখে বোঝা যায় না যে এই মণ্ডল থাকে থাকে ভাগ করা। এর যে প্রথম থাকটা পৃথিবীর সব কাছে, তার বৈজ্ঞানিক নাম ট্রপোস্ফিয়র, বাংলায় একে ক্ষুব্ধ স্তর বলা যেতে পারে। পাঁচ থেকে দশ মাইলের বেশি এর চড়াই নয়। সমগ্র বায়ুমণ্ডলের মাপে এই ক্ষুব্ধ স্তরের উচ্চতা খুবই কম, কিন্তু এইটুকুর মধ্যেই আছে বাতাসের সমস্ত পদার্থের প্রায় ৯০ ভাগ। কাজেই অন্য স্তরের চেয়ে এ স্তর অনেক বেশি ঘন। পৃথিবীর একেবারে গায়ে লেগে আছে ব'লে এই স্তরে সর্বদা পৃথিবীর উত্তাপের

ছোঁয়াচ লাগে। সেই উত্তাপের কমায় বাড়ায় হাওয়া এখানে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে। এই স্তরেই তাই ঝড় বৃষ্টি। এর আরো উপরে যে স্তর, পৃথিবীর তাপ সেখানে ঝড় তুফান চালান করতে পারে না। তাই সেখানকার হাওয়া শান্ত। পণ্ডিতেরা এ স্তরের নাম দিয়েছেন stratosphere বাংলায় আমরা বলব স্তব্ধ স্তর।

গোড়ায় ছিল এই পৃথিবী একটামাত্র গ্যাসের গোলা, তারপর জলে স্থলে বাতাসে মিলে হোলো এর বিচিত্র বিকাশ। সময় তো কম লাগেনি। কিন্তু এত বড়ো সময়েরও হিসাব বের করবার একটা পথ পাওয়া গেছে, সেটা জেনে রাখা ভালো। রেডিয়মের কথা আগেই বলেছি। এই রেডিয়মের পরমাণুর মধ্যে বিপুল তেজ নিয়ত অশান্ত থাকায় সব সময় এর ভিতর চলছে একটা ভাঙাচোরার কাজ। রেডিয়মের পরমাণু ভেঙে সৃষ্টি হচ্ছে সীসের পরমাণু ; রেডিয়মের এই ভাঙন কী নিয়মে চলছে, কতটা রেডিয়ম ভাঙতে কত সময় লাগে, তাতে কতটা সীসের সৃষ্টি হয় এ সব তথ্যের একটা হিসাব পাওয়া গেছে। কোনো পাহাড়ে তার পাথরের মধ্যে এক টুকরা রেডিয়ম যদি পাওয়া যায় তাহোলে সেই রেডিয়মের কতটা ক্ষয় হয়ে সীসে হোতে কী পরিমাণ সময় লেগেছে হিসেব করলেই পাথরটার বয়স ধরা পড়বে। আমেরিকার পূর্ব ক্যানাডার কোনো পাহাড়ের পাথরে রেডিয়ম পাওয়া গেছে। তার থেকে জানা গেল যে প্রায় ১২৩ কোটি বছর আগে তৈরি হয়েছিল এই পাহাড়।

খুব পাতলা কতকগুলো অভ্রের টুকরো অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রাখলে অনেক সময় এদের মধ্যে রঙিন আভামণ্ডলী দেখা যায়, তারই কেন্দ্রে সব সময়ই থাকে ছোটো এক টুকরো তেজস্ক্রিয় পদার্থ। তারই নিয়ত ভাঙন থেকে এই আভামণ্ডলীর সৃষ্টি। যতই দিন যায় রঙিন মণ্ডলীর রঙ ততই গাঢ় হোতে থাকে। মণ্ডলীর আয়তন ও রঙ দেখেই বিজ্ঞানী ব'লে দিতে পারেন ঐ অভ্রের টুকরো কত বছরের পুরোনো। এই রকমের নানা পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা ঠিক করেছেন যে প্রায় ২০০ কোটি বছর আমাদের পৃথিবীর বয়স।

আদি সূর্য থেকে যেমন পৃথিবী বেরিয়ে এসেছে তেমনি বাষ্পদেহী আদিম পৃথিবী থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঁদ, একই নিয়মে। তার পরে কোটি কোটি বৎসরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হোলো, চাঁদও হোলো তাই।

২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল দূরে থেকে ২৭⅓ দিনে চাঁদ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করছে। সেই প্রদক্ষিণের কালে কেবল একটা পিঠ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে রেখেছে। এর ব্যাস প্রায় ২১৬০ মাইল, এর উপাদান জল থেকে ৩॥০গুণ ভারি। অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রের তুলনায় পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব খুবই কম ব'লে একে এত উজ্জ্বল ও আয়তনে এত বড়ো দেখায়। আশিটি চাঁদ একসঙ্গে ওজন করলে পৃথিবীর ওজনের সমান হবে। দূরবীনে চাঁদকে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় পৃথিবীর মতোই শক্ত জিনিসে এ তৈরি। ওর উপরে আছে বড়ো বড়ো গহ্বর আর বড়ো বড়ো পাহাড়।

চাঁদের ওজন থেকে হিসেব করা হয়েছে যে কোনো জিনিসের গতিবেগ যদি সেখানে সেকেণ্ডে ১৷৷০ মাইল হয় তা হোলে চাঁদের টান অগ্রাহ্য করে তা ছুটে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। চাঁদ যে নিয়মে অতিমাত্রায় রোদ পোহায় তাতে তার তেতে-ওঠা পিঠের উপরে হাওয়া এত গরম হয়ে উঠেছিল যে চাঁদ তার বাতাসের পরমাণুদের ধরে রাখতে পারে নি, তারা সবাই গেছে বেরিয়ে। যেখানে হাওয়ার চাপ নেই সেখানে জল খুব তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে যায়। বাষ্প হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলের পরমাণু গরমে চঞ্চল হয়ে চাঁদের বাঁধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। জল হাওয়া যেখানে নেই সেখানে কোনো রকমের প্রাণ টিঁকতে পারে ব'লে আমরা জানিনে।

রাতের বেলায় যাদের আমরা খসে পড়া তারা বলি, সে গুলো যে তারা নয় তা আজ আর কাউকে বলতে হবে না। সেই উল্কাপিণ্ডগুলো পৃথিবীর টানে দিন রাত লাখো লাখো পড়ছে পৃথিবীর উপর। তার অধিকাংশই বাতাসের ঘেঁষ লেগে জ্বলে উঠে ছাই হয়ে যাচ্ছে। যেগুলো বড়ো আয়তনের, তারা জ্বলতে জ্বলতে মাটিতে এসে পৌঁছয়, বোমার মতো যায় ফেটে, চারদিকে যা পায় দেয় ছারখার করে।

চাঁদেও ক্রমাগত এই উল্কাবৃষ্টি হচ্ছে। ওদের ঠেকিয়ে ছাই করে দেবার মতো একটু হাওয়া নেই, অবাধে ওরা ঢেলা মারছে চাঁদের সর্বাঙ্গে। বেগ কম নয়, সেকেণ্ডে প্রায় ত্রিশ মাইল, সুতরাং ঘা মারে সর্বনেশে জোরে।

চাঁদে বড়ো বড়ো গর্তের উৎপত্তি অগ্নি-উৎস থেকেই। সে গলন্ত পদার্থ ও ছাই তখন বেরিয়ে এসেছিল, হাওয়া জল না থাকায় এতযুগ ধরেও তাদের কোনো বদল হোতে পারেনি। ছাই ঢাকা আছে ব'লে সূর্যের আলো এই আবরণ ভেদ করে খুব বেশি নিচে যেতে পারে না, আর নিচের উত্তাপও উপরে আসতে পারে না।

চাঁদের যেদিকে সূর্যের আলো পড়ে তার উত্তাপ হয় প্রায় ফুটন্ত জলের সমান, আর যেখানে আলো পড়ে না, তা এত ঠাণ্ডা হয় যে বরফের শৈত্যের চেয়েও তা প্রায় ২৫০ ডিগ্রী নিচে থাকে। চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া এসে যখন চাঁদের উপরে পড়ে তখন তার উত্তাপ কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রায় ৩৪৬ ডিগ্রী কমে যায়।

হাওয়া না থাকায় ও ছাইয়ের আবরণ ভেদ করে সূর্যের আলো নিচে প্রবেশ করতে পারে না ব'লে সঞ্চিত কোনো উত্তাপই চাঁদে নেই; তাই এত তাড়াতাড়ি এর উত্তাপ কমে আসে। এসব প্রমাণ থেকে বলা যায় যে আগ্নেয়গিরির ছাই ঢেকে রেখেছে চাঁদের প্রায় সব জায়গা।

আদিকালে পৃথিবীতে জীবনের কোনো চিহ্নই ছিল না। প্রায় সত্তর আশি কোটি বছর ধরে চলেছিল নানা আকারে তেজের উৎপাত। কোথাও অগ্নিগিরি ফুঁসছে তপ্ত বাষ্প, উগ্‌রে দিচ্ছে তরল ধাতু, ফোয়ারা ছোটাচ্ছে গরম জলের।

নিচের থেকে ঠেলা খেয়ে কাঁপছে ফাটছে ভূমিতল, উঠে পড়ছে পাহাড় পর্বত, তলিয়ে যাচ্ছে ভূখণ্ড।

পৃথিবীর শুরু থেকে দেড়শো কোটি বছর যখন পার হোলো তখন অশান্ত আদিযুগের মাথা কুটে মরা অনেকটা থেমেছে। এমন সময়ে সৃষ্টির সকলের চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা দেখা দিল। কেমন করে কোথা থেকে প্রাণের ও সঙ্গে সঙ্গে মনের উদ্ভব হোলো তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। তার আগে পৃথিবীতে সৃষ্টির কারাখানাঘরে তোলাপাড়া ভাঙাগড়া চলছিল প্রাণহীন পদার্থ নিয়ে। তার উপকরণ ছিল মাটি জল, লোহা পাথর প্রভৃতি; আর সঙ্গে সঙ্গে ছিল অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি কতকগুলি গ্যাস। নানা রকমের প্রচণ্ড আঘাতে তাদেরই উলটপালট করে জোড়াতাড়া দিয়ে নদী পাহাড় সমুদ্রের রচনা ও অদলবদল চলছিল। এমন সময়ে এই বিরাট জীবহীনতার মধ্যে দেখা দিল প্রাণ, আর তার সঙ্গে মন। এদের পূর্ব্ববর্তী পদার্থরাশির সঙ্গে এর কোনোই মিল নেই।

নক্ষত্রদের প্রথম আরম্ভ যেমন নীহারিকায় তেমনি পৃথিবীতে জীবলোকে প্রথম যা প্রকাশ পেল তাকে বলা যেতে পারে প্রাণের নীহারিকা। সে একরকম অপরিস্ফুট ছড়িয়ে পড়া প্রাণ পদার্থ, ঘন লালার মতো অঙ্গবিভাগহীন; তখনকার ঈষৎ গরম সমুদ্রজলে ভেসে বেড়াত। তার নাম দেওয়া হয়েছে প্রটোপ্লাজম্। যেমন নক্ষত্র দানা বেঁধে ওঠে আগ্নেয় বাষ্পে, তেমনি বহুযুগ লাগল এর মধ্যে মধ্যে একটি

একটি পিণ্ড জমতে। সেই গুলির এক শ্রেণীর নাম দেওয়া হয়েছে অমীবা ; আকারে অতি ছোটো ; অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায়। পঙ্কিল জলের ভিতর থেকে এদের পাওয়া যেতে পারে। এদের মুখ চক্ষু হাত পা নেই। আহারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। দেহপিণ্ডের এক অংশ প্রসারিত করে দিয়ে পায়ের কাজ করিয়ে নেয়। খাবারের সম্পর্কে এলে সেইটেকে ঢেকে সর্বাঙ্গ দিয়ে খাদ্য আত্মসাৎ করে। সমস্ত দেহটাই তার মুখ, তার পাকযন্ত্র। নিজের দেহটাকে ভাগ করে করে তার বংশবৃদ্ধি হয়। এই অমীবারই আর এক শাখা দেখা দিল, তারা দেহের চারদিকে আবরণ বানিয়ে তুললে, শামুকের মতো। সমুদ্রে আছে এদের কোটি কোটি সূক্ষ্ম দেহ। এদের এই দেহপঙ্ক জমে জমে পৃথিবীর স্থানে স্থানে খড়িমাটির পাহাড় তৈরি হয়েছে।

বিশ্বরচনার মূলতম উপকরণ পরমাণু ; সেই পরমাণুগুলি অচিন্তনীয় বিশেষ নিয়মে অতি সূক্ষ্ম জীবকোষরূপে সংহত হোলো। প্রত্যেক কোষটি সম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র, তাদের প্রত্যেকের নিজের ভিতরেই একটা আশ্চর্য শক্তি আছে যাতে করে বাইরে থেকে খাদ্যগ্রহণ করে নিজেকে পুষ্ট, অনাবশ্যককে ত্যাগ ও নিজেকে বহুগুণিত করতে পারে। এই বহুগুণিত করার শক্তির দ্বারা ক্ষয়ের ভিতর দিয়ে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রাণের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলে।

এই জীবাণুকোষ প্রাণলোকে প্রথমে একলা হয়ে দেখা দিয়েছে। তারপরে এরা যত সংঘবদ্ধ হোতে থাকল ততই

জীবজগতে উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য ঘটতে লাগল। যেমন বহু কোটি তারার সমবায়ে এক একটি নীহারিকা তেমনি বহুকোটি জীবকোষের সমাবেশে এক একটি দেহ। বংশাবলীর ভিতর দিয়ে এই দেহজগৎ একটি প্রবাহ সৃষ্টি করে নূতন নূতন রূপের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আমরা এতকাল নক্ষত্রলোক সূর্যলোকের কথা আলোচনা করে এসেছি। তার চেয়ে বহুগুণ বেশি আশ্চর্য এই প্রাণলোক। উদ্দাম তেজকে শান্ত করে দিয়ে ক্ষুদ্রায়তন গ্রহরূপে পৃথিবী যে অনতিক্ষুব্ধ পরিণতি লাভ করেছে সেই অবস্থাতেই প্রাণ এবং তার সহচর মনের আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছে একথা যখন চিন্তা করি তখন স্বীকার করতেই হবে জগতে এই পরিণতিই শ্রেষ্ঠ পরিণতি। যদিও প্রমাণ নেই, এবং প্রমাণ পাওয়া আপাতত অসম্ভব তবু একথা মানতে মন যায়না যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই জীবধারণযোগ্য চৈতন্যপ্রকাশক অবস্থা একমাত্র এই পৃথিবীতেই ঘটেছে, যে এই হিসাবে পৃথিবী সমস্ত জগৎধারার একমাত্র ব্যতিক্রম।

উপসংহার

একদা জগতের সকলের চেয়ে মহাশ্চর্য বার্তা বহন করে বহুকোটি বৎসর পূর্বে তরুণ পৃথিবীতে দেখা দিল আমাদের চক্ষুর অদৃশ্য একটি জীবকোষের কণা। কী মহিমার ইতিহাস সে এনেছিল কী লুকিয়ে। দেহে দেহে অপরূপ শিল্প সম্পদ-শালী তার সৃষ্টিকার্য নব নব পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অনবরত চলে আসছে। যোজনা করবার, শোধন করবার, অতি জটিল কর্মতন্ত্র উদ্ভাবন ও চালনা করবার বুদ্ধি প্রচ্ছন্নভাবে তাদের মধ্যে কোথায় আছে, অথবা তাদের ভিতর দিয়ে নিজেকে সক্রিয় করছে, উত্তরোত্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে, ভেবে তার কিনারা পাওয়া যায় না। অতিপেলব বেদনাশীল জীব-কোষগুলি বংশাবলিক্রমে যথাযথ পথে সমষ্টি বাঁধছে জীব-দেহে নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে; নিজের ভিতরকার উদ্যমে জানি না কী ক'রে দেহক্রিয়ার এমন আশ্চর্য কর্তব্য বিভাগ রচে। যে কোষ পাকযন্ত্রের, তার কাজ এক রকমের, যে কোষ মস্তিষ্কের, তার কাজ একেবারেই অন্যরকমের। অথচ জীবাণুকোষগুলি মূলে একই। এদের দুরূহ কাজের ভাগ-বাঁটোয়ারা হোলো কোন্ হুকুমে এবং এদের বিচিত্র কাজের মিলন ঘটিয়ে স্বাস্থ্য নামে একটা সামঞ্জস্য সাধন করল কিসে। জীবাণুকোষের দুটি প্রধান ক্রিয়া আছে, বাইরে থেকে খাবার জুগিয়ে বাঁচা ও বাড়তে থাকা, আর নিজের অনুরূপ জীবকে উৎপন্ন করে বংশধারা চালিয়ে যাওয়া। এই

আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার জটিল প্রয়াস গোড়াতেই এদের উপর ভর করল কোথা থেকে ?

অপ্রাণ বিশ্বে যে সব ঘটনা ঘটছে তার পিছনে আছে সমগ্র জড় জগতের ভূমিকা। মন এই সব ঘটনা জানছে, এই জানাব পিছনে মনের একটা বিশ্বভূমিকা কোথায়। পাথর লোহা গ্যাসের নিজের মধ্যে তো জানার সম্পর্ক নেই। এই দুঃসাধ্য প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ একটা যুগে প্রাণ মন এল পৃথিবীতে—অতি ক্ষুদ্র জীবকোষকে বাহন ক'রে।

পৃথিবীব সৃষ্টিইতিহাসে এদের আবির্ভাব অভাবনীয়। কিন্তু সকল কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধহীন একান্ত আকস্মিক কোনো অভ্যুৎপাতকে আমাদের বুদ্ধি মানতে চায় না। আমরা জড়-বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃ পদার্থের মধ্যে। অনেককাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে আপাতদৃষ্টিতে যে সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতির্হীন, তাদেব মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরো সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্ব-সৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে চৈতন্যে তারই প্রকাশ। জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহা-চৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।